দেশ বিভাগের ক্রান্তিকালে মুর্শিদাবাদ

প্রকাশ দাস বিশ্বাস

দেশবিভাগের ক্রান্তিকালে মুর্শিদাবাদ

প্রকাশ দাস বিশ্বাস

আকাশ
(প্রিন্টার্স অ্যাণ্ড পাবলিশার্স)
৫২ বাবুপাড়া, গোরাবাজার, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ

তোমাকে...
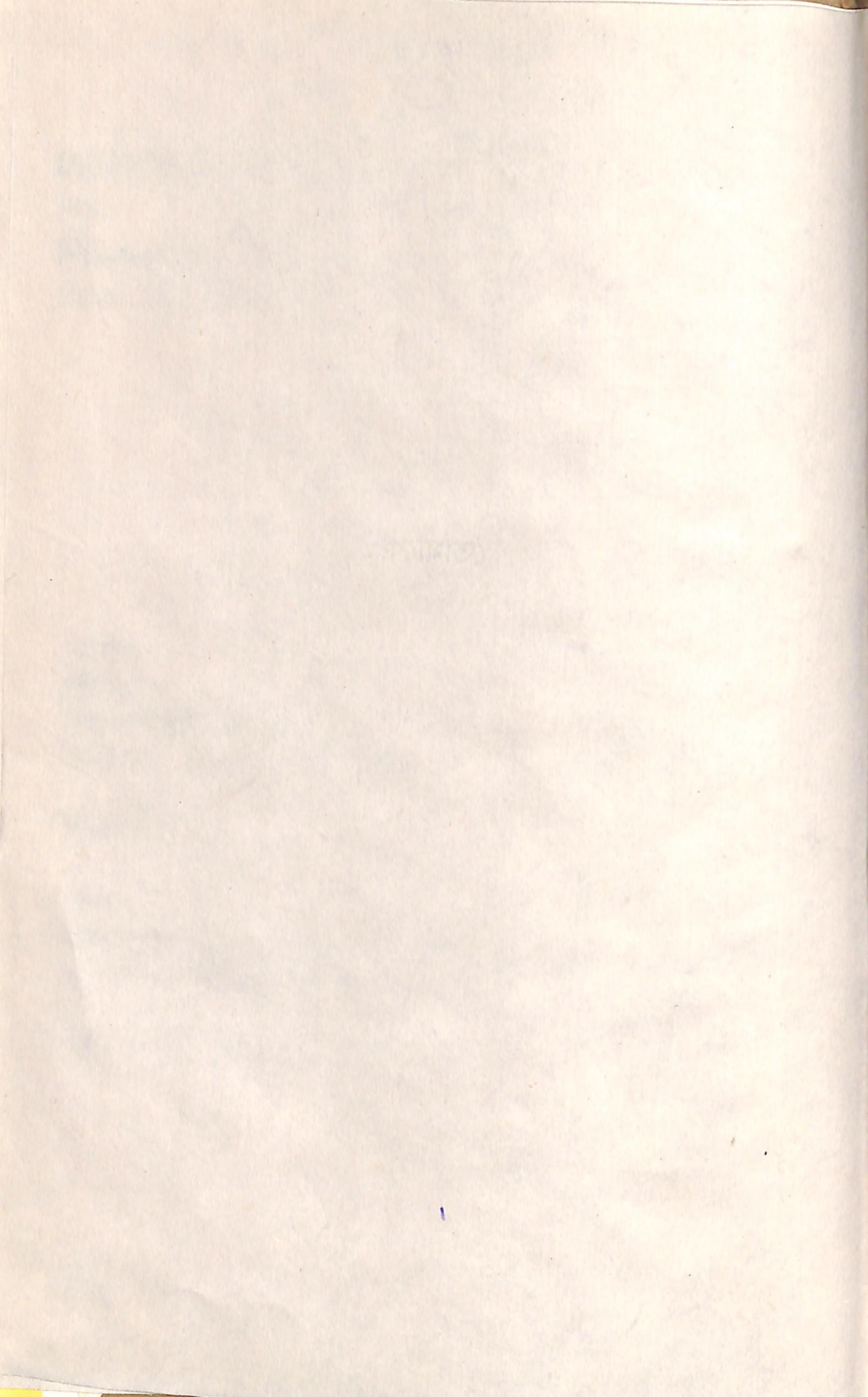
অনধিকারীর কৈফিয়ত

মুর্শিদাবাদ জেলার ইতিহাস নিয়ে বহু বইপত্র প্রবন্ধাদি লেখা হওয়া সত্ত্বেও আরেকটি বই লেখার দরকার হ'ল কেন এ প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। আত্মপক্ষ সমর্থনে বলা যেতে পারে যে এটি জেলার কোন পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস নয়। দেশবিভাগের কালপর্বে জেলার অস্থির সময়ের এক নৈর্ব্যক্তিক ধারাবিবরণী এই বইটি। জেলার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস নিয়ে বিভিন্ন সময়ে বেশ কয়েকটি বই লেখা হলেও তার পরও নিত্যনতুন গবেষণায় নতুন নতুন তথ্য প্রকাশিত হয়ে চলেছে। গোয়েন্দা বিভাগের গোপন তথ্য সর্বসমক্ষে আসায় পাল্টে গেছে বহু প্রচলিত ধারণা। সেই সব নতুন তথ্য নিয়ে ইতিহাসের পূনর্নির্মাণ জরুরী — সেই ধারণা থেকেই এই বই লেখার প্রয়াস। অনেক ক্ষেত্রেই মূল সূত্র বা বই দেখার সৌভাগ্য হয়নি। সেক্ষেত্রে গৌন সূত্র (সেকেন্ডারী সোর্স) -ই ব্যবহার করা হয়েছে। আগ্রহী পাঠকদের জন্য মূল তথ্যসূত্র এবং গৌন সূত্র উভয়েরই উল্লেখ করা হয়েছে। আরেকটি কথাও বলে রাখা দরকার এ বই সেই সব সাধারণ মানুষের জন্য লেখা যারা সংক্ষেপে মূল কথাটুকু জানতে চান। ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত প্রামাণ্য বই থেকে মূল তথ্য উদ্ধার করা তাদের অনেকের পক্ষেই অসম্ভব। তাদের জন্যই নিতান্ত অনধিকারীর এই প্রয়াস আর সেই কারণেই প্রামাণ্য ইংরাজী বই থেকে প্রয়োজনীয় উদ্ধৃতি দিয়ে এ বইকে ভারাক্রান্ত করা হয় নি — তবে আগ্রহী পাঠকেরাও যাতে বঞ্চিত না হন তার জন্য উল্লেখ করা হয়েছে মূল তথ্যের। বইয়ের নাম 'দেশবিভাগের ক্রান্তিকালে মুর্শিদাবাদ' হলেও এ বইয়ে অবধারিত ভাবে এসেছে দিল্লীর কূট রাজনীতির কথা, এসেছে বাংলার পরিষদীয় রাজনীতির মূলকেন্দ্র কলকাতার রাজনৈতিক টানাপোড়েন — যার উল্লেখ ছাড়া মুর্শিদাবাদের পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করা কার্যত অসম্ভব। এ বই যদি পাঠকদের ভাবনা চিন্তাকে একটু উস্‌কে দিতে পারে তবেই শ্রম সার্থক বলে মনে করব।

এই লেখার প্রাথমিক খসড়াটি জেলার অগ্রণী সাহিত্য পত্রিকা 'জলসিড়ি'-র ১৪০৮ এবং ১৪০৯ বঙ্গাব্দের শারদীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। লেখাটি প্রকাশিত হবার পর নানা সুধীজনের নানা পরামর্শ লেখাটির পরিমার্জনায় সাহায্য করেছে। তাদের সবাইকে আমার ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। জলসিড়ির সহ-সম্পাদক শ্রী অপূর্ব ভট্টাচার্যর ঋণও এই প্রসঙ্গে স্বীকার করি। তাঁর নিরন্তর তাগাদাতেই বহু কাজের মধ্যেও এই বিষয়ে লিখতে শুরু করেছিলাম। ধন্যবাদ প্রাপ্য শ্রী কমল সমাজদ্দারেরও। বহু দুস্প্রাপ্য কাগজপত্র তাঁরই সৌজন্যে দেখতে ও ব্যবহার করতে পেরেছি। আর ভ্রাতৃপ্রতিম প্রকাশক শ্রী অভিজিৎ রায় এই বই প্রকাশের আর্থিক দায়িত্ব বহন করে আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছে। ধন্যবাদ প্রাপ্য তারও।

১৭ই ফেব্রুয়ারী, ২০০৩ — **প্রকাশ দাস বিশ্বাস**

চালতিয়া, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ

(১)

দেশভাগ যে কোন আকস্মিক ঘটনা ছিল না এ আর আজ কোনো নতুন কথা নয়। বিভিন্ন নথিপত্র এবং সাম্প্রতিক নানা গবেষণা থেকে এ কথা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে দেশভাগের পিছনে যেমন দেশবাসীর সাম্প্রদায়িক মনোভাব কাজ করেছিল তেমনি বিদেশী শাসকের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থও তাতে সমানে ইন্ধন জুগিয়েছিল। কংগ্রেসের দেশব্যাপী আন্দোলনের রাশ টেনে ধরতে ব্রিটিশরা সুচতুরভাবে মুসলিম লীগকে কাজে লাগিয়েছিল। মূলত তাদেরই পৃষ্ঠপোষকতায় মুসলিম লীগ কংগ্রেসের মতো গণসংগঠনের সঙ্গে একই সারিতে আসন লাভ করে এবং নির্লজ্জ দরাদরিতে সমর্থ হয়। সেদিক থেকে দেখতে গেলে দেশবিভাগ ছিল এক অনিবার্য ঘটনা, যার বীজ উপ্ত হয়েছিল দেশ বিভাগের অনেক আগেই।

দেশবিভাগের ক্রান্তিকালে মুর্শিদাবাদের ঘটনাবলী যে তৎকালীন ভারতবর্ষের মুসলমান প্রধান এলাকার ঘটনাবলীর চেয়ে খুব আলাদা ছিল তা নয় তবুও তা স্বতন্ত্র উল্লেখের দাবী রাখে কেননা দেশবিভাগ পরবর্তীকালে মুর্শিদাবাদের ভারতভুক্তি নানা বিতর্কের জন্ম দিয়েছিল। তবে মুর্শিদাবাদের ঘটনাবলী ছিল প্রতিক্রিয়া — মূল ক্রিয়া সংঘটিত হয় রাজনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু দিল্লীতে। তাই এই প্রসঙ্গে বার বার আসবে দিল্লীর কূট রাজনীতির কথা, যার উল্লেখ ছাড়া দেশবিভাগের ক্রান্তিকালে মুর্শিদাবাদের ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করা শুধু দুরূহ নয় কার্যত অসম্ভবও।

যদিও আনুষ্ঠানিক দেশবিভাগ হয় ১৯৪৭ সালে তবুও দেশবিভাগ যে হতে চলেছে তা বোঝা গেছিল বিংশ শতাব্দীর ত্রিশের দশকেই। রাজনৈতিক ক্ষমতাচ্যুত হয়ে শাসক শ্রেণী থেকে হতদরিদ্র প্রজায় পরিণত হওয়া দেশের মুসলমান সমাজ কখনোই মনে প্রাণে মেনে নিতে পারেনি। অন্যদিকে হিন্দু সমাজ যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলায় তাদের তেমন ক্ষতি হয়নি। আরবী, ফার্সী শিখে অভিজাত হিন্দুরা যেমন মুসলিম শাসনকালে উচ্চপদ লাভে সমর্থ হয়েছিল তেমনি ইংরেজ রাজত্বকালে অতি দ্রুত ইংরেজী শিখে তারা সেই আসন ধরে রাখতে সমর্থ হয়। মুসলমানেরা যুগের সঙ্গে তাল মেলাতে ব্যর্থ হওয়ায় এই প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ে এবং নিজেদের বঞ্চিত ভাবতে থাকে। এর থেকেই জন্ম নেয় হীনমন্যতা। সেই বঞ্চনাবোধ আর হীনমন্যতা থেকেই তাদের মনে ধুমায়িত হতে থাকে অসন্তোষ — তারই অমোঘ অনিবার্য ফলশ্রুতি দেশবিভাগ।

সিদ্ধান্তটা অতি সরলীকৃত মনে হতে পারে। কোন সন্দেহ নাই দেশবিভাগের পিছনে আরো অজস্র কারণ ছিল। কিন্তু প্রধান কারণ যে ছিল সম্ভাব্য হিন্দু ভারতে মুসলমানের সম্ভাব্য বঞ্চনা এবং তজ্জনিত বিপন্নতা এ নিয়ে সন্দেহের বিশেষ অবকাশ নেই। দেশবিভাগের সেই ক্রান্তিকালে সমগ্র দেশের পরিস্থিতিই ছিল উত্তাল। আজাদ হিন্দ ফৌজের বীরত্বপূর্ণ অভিযানের রেশ কাটতে না কাটতেই 'গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং' (১৬ ই আগষ্ট, ১৯৪৬) -এর ভয়াবহ অভিজ্ঞতা দেশবাসীকে হতচকিত করেছিল। যাদের মনে দেশবিভাগ নিয়ে সামান্যতম

সংশয় ছিল কলকাতা আর নোয়াখালির বীভৎস দাঙ্গা তাদের কাছেও পরিষ্কার করে দেয় যে দেশবিভাগ হচ্ছেই। সর্বত্রই শুরু হয়ে যায় দেশবিভাগের প্রস্তুতি। সেই অশান্ত সময়ে সারা দেশেই একটা কি হয় কি হয় ভাব ছিল কিন্তু মুর্শিদাবাদের বিষয়টা ছিল একটু আলাদা। কেন আলাদা সেটা খতিয়ে দেখতে গেলে আমাদের জেলার তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতির দিকে নজর দিতে হবে। মুর্শিদাবাদের ভবিষ্যত নিয়ে বিভিন্ন পর্যায়ে আশঙ্কা যে নেহাৎ অমূলক ছিল না তা বোঝা যাবে তৎকালীন পরিস্থিতি পর্যালোচনাতেই।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে মুর্শিদাবাদ জেলা ছিল হিন্দুপ্রধান[২]। বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই এ জেলা মুসলিম প্রধান হয়ে পড়ে। তারপর থেকেই জেলায় মুসলিমদের আনুপাতিক হার ক্রমশ বেড়ে চলেছে। বিগত শতাব্দীর শুরু থেকেই এ জেলা মুসলিম প্রধান হলেও মুসলিম লীগ রাজনীতির প্রথম দিকে (মুসলিম লিগের জন্ম ১৯০৬ সালে) জেলার মুসলিম রাজনীতি তেমন প্রবল ছিল না। জেলার মুসলিম বুদ্ধিজীবিরা কংগ্রেসের পতাকাতলেই রাজনীতি করেছেন এবং এদের মধ্যে বেশ কয়েকজন জাতীয়তাবাদী নেতা হিসাবে রাজ্য এবং জাতীয় স্তরেও নিতান্ত অপরিচিত ছিলেন না।

মুসলিম লীগের জেলা কমিটি ১৯২৭ সালের কোন এক সময়ে গঠিত হয়[৩]। এরই কাছাকাছি সময়ে জেলায় হিন্দু মহাসভার শাখা স্থাপিত হয়। মুসলিম লীগের জেলা কমিটি গঠিত হবার পর জেলার মুসলিম সম্প্রদায়ের কিছু উচ্চাকাঙ্খী নেতা মুসলিম লীগে যোগ দেন এবং কালক্রমে তারাই জেলার মুসলিম রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করতে থাকেন। যদিও কংগ্রেসের মুসলিম জাতীয়তাবাদী নেতারা আইনসভা এবং আইনসভার বাইরে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন, তবুও একথা অনস্বীকার্য যে জেলার সাধারণ মুসলমান জনসাধারণের উপর জাতীয়তাবাদী নেতাদের চেয়ে মুসলিম লীগ নেতাদের প্রভাব ছিল যথেষ্ট বেশী। সাধারণ মুসলিমরা কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদের চেয়ে মুসলিম লীগের ঐশ্লামিক ভ্রাতৃত্ববোধের প্রচারে বেশী আকৃষ্ট হতেন। তবে একথা অনস্বীকার্য যে লীগ রাজনীতির শুরুর পর্বে জেলায় সাম্প্রদায়িকতার তেমন প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় না। ১৯৩১ সালের স্বতন্ত্র নির্বাচকমণ্ডলী (Separate electorate) ব্যবস্থা প্রবর্তনের পর থেকেই জেলার মুসলিম রাজনীতি প্রবল হয়ে উঠতে থাকে। সেই কালপর্বে কংগ্রেস বা কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদী মুসলিম নেতারা মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে সেভাবে প্রতিহত করতে পারেননি।

স্বতন্ত্র নির্বাচক মণ্ডলী সংক্রান্ত বিলের বিরুদ্ধে প্রাদেশিক আইন সভায় জেলা কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদী নেতা মৌলভী আবদুস সামাদের লড়াই এ প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আবদুস সামাদ ছিলেন জেলার প্রথিতযশা আইনজীবি এবং মুর্শিদাবাদ জেলা বোর্ডের সহ-সভাপতি। ১৯২৯ সালে তিনি মুসলিম লীগ প্রার্থীকে পরাজিত করে আইনসভায় নির্বাচিত হয়েছিলেন। লক্ষ্মৌ চুক্তির ভিত্তিতে সাইমন কমিশনের প্রস্তাবিত পৃথক নির্বাচনী ব্যবস্থা যে হিন্দু বা মুসলমান কারো স্বার্থই সিদ্ধ করবে না উল্টে তা সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থরক্ষার হাতিয়ার হয়ে উঠবে তা বুঝতে পেরেছিলেন আবদুস সামাদ। আইনসভায় তিনি বলেছিলেন যে স্বতন্ত্র নির্বাচকমণ্ডলী দ্বারা নির্বাচনী ব্যবস্থায় একজন মুসলিম ভোটপ্রার্থীকে তার নির্বাচকদের

সামনে বলতে হবে যে প্রথমত তিনি একজন মুসলমান তারপর তিনি ভারতীয়। তিনি যত বেশী সাম্প্রদায়িক বা জাতীয়তাবিরোধী ভূমিকা পালন করবেন তার সাফল্যের সম্ভাবনা তত বেশী উজ্জ্বল। একইভাবে একজন হিন্দু ভোটপ্রার্থীকেও অনুরূপ ব্যবস্থা নিতে হবে। এর ফল অমোঘ। এই নতুন আইন যেদিন থেকে বলবৎ হয়েছে, সেদিন থেকেই হিন্দু ও মুসলমানদের সম্পর্ক ক্রমে ক্রমে তিক্ত হতে শুরু করেছে এবং ভয়ঙ্কর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রতিদিনের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে[১]।

আবদুস সামাদ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দিয়েছিলেন যে সাইমনের বিভেদ নীতি চিরদিনের জন্য ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বিকাশ রোধ করবে। আরেকটি বিতর্কে তিনি মত প্রকাশ করেন যে মুসলিম মৌলবাদীরা সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ক্রীড়নক এবং তারা বিদেশী শাসকদের 'ডিভাইড এ্যাণ্ড রুল' নীতিকেই পুষ্ট করছে। তারা মুসলিম সমাজের বন্ধুর ভান করছে। ঈশ্বর মুসলিমদের তথাকথিত বন্ধুদের হাত থেকে রক্ষা করুন[২]।

সামাদ সাহেব বিশ্বাস করতেন যে স্বতন্ত্র নির্বাচকমণ্ডলী নয়, সামাজিক সংস্কার, মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার এবং মুসলিম নারী সম্প্রদায়ের মুক্তি একান্ত প্রয়োজনীয় আর এর ফলেই লক্ষ লক্ষ গরীব মুসলমানদের উন্নতি হবে।

ওই কালপর্বে জেলার সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব রেজাউল করীমের ভূমিকাও ছিল একই রকমের উজ্জ্বল। কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদী নেতা হিসাবে তিনি স্বতন্ত্র নির্বাচক মণ্ডলী সমন্বিত নির্বাচনী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলতে সক্রিয় হন। তিনি জেলার বিভিন্ন প্রান্তে তাঁর বক্তৃতায় বোঝাতে চাইতেন যে পৃথকীকরণের নীতি মুসলিম সমাজের কোন উপকার করবে না উপরন্তু তা পারস্পরিক সন্দেহ আর অবিশ্বাসের জন্ম দেবে।

আবদুস সামাদ, রেজাউল করীম প্রমুখ জাতীয়তাবাদী মুসলিম নেতারা যখন স্বতন্ত্র নির্বাচক মণ্ডলী সমন্বিত নির্বাচনী ব্যবস্থার বিরোধিতায় ব্যস্ত তখন কিন্তু মুসলিম লীগের নেতারা ক্রমাগত প্রচার করে চলেছিলেন যে মুসলমানদের স্বার্থরক্ষায় স্বতন্ত্র নির্বাচকমণ্ডলী ব্যবস্থা খুবই ফলপ্রসু হবে এবং তা খুবই দরকারী। আবদুল বারী, ফারহাদ মূর্তজা রেজা চৌধুরী, নবাবজাদা কাজেম আলি মির্জা প্রমুখ লীগ নেতাদের নিরন্তর প্রচার এবং লীগের হিন্দু বিরোধী জিগির যে জেলার সামাজিক এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পরিবেশকে দূষিত করে তুলছিল তার প্রমাণ রয়েছে ত্রিশ (১৯৩০) পরবর্তী জেলার ঘটনাবলীতে। সে প্রসঙ্গে আসার আগে জেলার হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদী হিন্দু মহাসভার রাজনীতি সম্পর্কে আলোচনা করা দরকার কেননা মুসলিম লীগের হিন্দু বিরোধী রাজনীতির পরিপূরক ছিল হিন্দু মহাসভার লীগ বিরোধী রাজনীতি।

গত শতাব্দীর বিশের দশকের শেষাশেষি প্রায় একই সময়ে মুসলিম লীগ এবং হিন্দু মহাসভার জেলা কমিটি গঠিত হয়। জেলায় হিন্দু মহাসভার রাজনীতির মুখ্য পৃষ্ঠপোষক ছিলেন কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী এবং তার পুত্র মহারাজ কুমার শ্রীশচন্দ্র নন্দী, মণীন্দ্রচন্দ্র জীবনের প্রথম পর্যায়ে জাতীয়তাবাদী নেতা হিসাবেই পরিচিত ছিলেন। টাউন হলে বিলাতী দ্রব্য বর্জনের ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী সভায় তিনি সভাপতি

ছিলেন[১]। তাঁর এই প্রগতিশীল ভূমিকা থেকে হিন্দু মহাসভার নেতায় রূপান্তর বিশেষ ইঙ্গিতবাহী। হয়তো দেশব্যাপী আগ্রাসী মুসলিম রাজনীতির অভিঘাত তাঁর এই পরিবর্তনে সহায়ক হয়েছিল। মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, শ্রীশচন্দ্র নন্দী ছাড়াও হিন্দু মহাসভার পৃষ্ঠপোষক হিসাবে রায়বাহাদুর সুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ, কিরীটিভূষণ দাস, জ্ঞান লাহিড়ী, বিজয়েন্দ্র নারায়ণ রায়, দ্বিজপদ চ্যাটার্জী প্রমুখের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মৌলভী আবদুস সামাদ, রেজাউল করীম -এর মতো জাতীয়তাবাদী নেতারা যখন আরো অনেকের সঙ্গে স্বতন্ত্র নির্বাচক মণ্ডলী দ্বারা নির্বাচনের সম্ভাব্য কুপ্রভাব নিয়ে জনমত সৃষ্টির চেষ্টা করছেন তখন মুসলিম লীগের নেতারা মুসলিমদের আশা আকাঙ্খা পূরণের জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচক মণ্ডলী দ্বারা নির্বাচনই একমাত্র উপায় বলে নিরন্তর প্রচার করছেন। আরো আশ্চর্যের কথা কাশিমবাজারের মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দীও স্বতন্ত্র নির্বাচক মণ্ডলীর প্রস্তাবকে সমর্থন করেছিলেন[১]।

মুসলিম লীগের নিরন্তর কংগ্রেস বিরোধী প্রচার এবং উগ্র হিন্দু বিরোধী প্রচার যে জেলার দরিদ্র এবং অশিক্ষিত মুসলিম জনসাধারণকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করতে পেরেছিল তার প্রমাণই পাওয়া গেল ১৯২৯, ১৯৩৭ এবং ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে। ১৯২৯ সালে জঙ্গীপুর মুসলিম নির্বাচন ক্ষেত্রে ফারহাদ মূর্তজা রেজা চৌধুরী মুসলিম লীগ প্রার্থী হিসাবে জয়ী হন। ওই নির্বাচনে রায়বাহাদুর কিরীটিভূষণ দাস মুর্শিদাবাদ সাধারণ নির্বাচন ক্ষেত্র থেকে নির্দল প্রার্থী হিসাবে জয়ী হলেও তাঁর পিছনে ছিল হিন্দু মহাসভার সমর্থন[১]।

১৯৩৭ সালের নির্বাচনে জেলার ছটি আসনের মধ্যে তিনটি দখল করে মুসলিম লীগ, দুটি কংগ্রেস এবং একটি হিন্দু মহাসভা সমর্থিত নির্দল প্রার্থী। বলা বাহুল্য মাত্র মুসলিমদের জন্য সংরক্ষিত তিনটি আসনের তিনটিতেই জয়ী হয় মুসলিম লীগের প্রার্থীরা। শুধু তাইই নয় বহরমপুর মুসলিম নির্বাচন ক্ষেত্র থেকে মুসলিম লীগ নেতা আব্দুল বারী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। অবশ্য ১৯৪১ সালে আব্দুল বারীর মৃত্যুর পর উপনির্বাচনে ওই আসনে জয়ী হন নিদল প্রার্থী সৈয়দ বদরুদ্দোজা। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগের অপর দুই নির্বাচিত প্রতিনিধি ছিলেন ফারহাদ মূর্তজা রেজা চৌধুরী (জঙ্গীপুর মুসলিম নির্বাচনক্ষেত্র) এবং নবাবজাদা কাজেম আলি মির্জা (মুর্শিদাবাদ দক্ষিণ মুসলিম নির্বাচনক্ষেত্র)।

১৯৪৬ সালের নির্বাচনে কংগ্রেস জেলায় ৩টি আসন দখল করে। জেলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক শ্যামাপদ ভট্টাচার্য মুর্শিদাবাদ গ্রামীণ সাধারণ নির্বাচনক্ষেত্র, কুবের চন্দ্র হালদার মুর্শিদাবাদ সাধারণ তপশীলি নির্বাচনক্ষেত্র এবং সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী প্রেসিডেন্সী ডিভিশন মিউনিসিপ্যাল সাধারণ নির্বাচনক্ষেত্র থেকে কংগ্রেস প্রার্থী হিসাবে জয়ী হন। অন্যদিকে মুর্শিদাবাদ দক্ষিণ পশ্চিম মুসলিম নির্বাচনক্ষেত্র থেকে কাজেম আলি মির্জা এবং জঙ্গীপুর গ্রামীণ মুসলিম নির্বাচন ক্ষেত্র থেকে ফারহাদ মূর্তজা রেজা চৌধুরী মুসলিম লীগ প্রার্থী হিসাবে নির্বাচিত হন। ষষ্ঠ আসনটি দখল করেন নির্দল প্রার্থী মহঃ খোদাবক্স। বহরমপুর গ্রামীণ মুসলিম নির্বাচনক্ষেত্রে তিনি মুসলিম লীগ প্রার্থী মৌলভী আবদুল গণিকে পরাজিত করে নির্বাচিত হন।

এখানে যেটি লক্ষ্যণীয় বিষয় সেটি হল এই যে সাধারণ নির্বাচনক্ষেত্রে কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদী প্রার্থীরা হিন্দু মহাসভা মনোনীত প্রার্থীদের সফলভাবে রুখে দিতে পারলেও মুসলিম নির্বাচনক্ষেত্রে কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদী মুসলিম প্রার্থীরা মুসলিম লীগ প্রার্থীদের জয় আটকাতে পারেননি। মহঃ খোদাবক্স মুসলিম লীগ প্রার্থীকে হারিয়ে নির্বাচন জিতলেও তিনি কংগ্রেস প্রার্থী ছিলেন না। এ থেকে বোঝা যায় যে মুসলিম লীগের নিরন্তর প্রচার যে কংগ্রেস আসলে হিন্দু স্বার্থ রক্ষাকারী হিন্দু প্রতিষ্ঠান তা জেলার সাধারণ মুসলিমদের মনে গভীর প্রভাব ফেলেছিল।

আরেকটি বিষয়ও লক্ষ্যণীয়। জেলার হিন্দু মহাসভার নেতৃত্বে ছিলেন মূলত জেলার হিন্দু জোতদার, জমিদার, সামন্ত প্রভুরা। হিন্দু স্বার্থরক্ষাকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে হিন্দু মহাসভার মুসলিম বিরোধী জিগির হিন্দু জনমানসে তেমন প্রভাব ফেলতে পারেনি। বিপরীতক্রমে মুসলিম লীগ কিন্তু অত্যন্ত সফলভাবে এই কাজটা করতে পেরেছিল। এদের উগ্র হিন্দু বিরোধী এবং একই সঙ্গে কংগ্রেস বিরোধী রাজনীতির সুফল এরা নির্বাচনে পেয়েছিল এবং জেলার মুসলিমদের স্বার্থরক্ষাকারী একমাত্র প্রতিষ্ঠান হিসাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিল।

স্বতন্ত্র নির্বাচকমণ্ডলী দ্বারা নির্বাচনী ব্যবস্থায় যখন স্বীকার করে নেওয়া হল যে ভারতবর্ষে হিন্দু মুসলমান দুটি আলাদা জনগোষ্ঠী এবং তাদের স্বার্থ পরস্পরের থেকে আলাদা তখনই অনেক দূরদৃষ্টি সম্পন্ন নেতারা বুঝে নিয়েছিলেন যে এর পর মুসলিম লীগের দাবী ক্রমাগত বাড়তে থাকবে এবং কংগ্রেসের ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন বাঞ্ছিত সাফল্য পাবে না। বাস্তব ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল মুসলিম লীগের নেতৃত্বে দেশের মোট অধিবাসীদের এক বিপুল অংশ স্বাধীনতা সংগ্রামে সেভাবে অংশ না নেওয়ায় বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধে সর্বাধিক চাপ সৃষ্টি করা যায় নি।

১৯৩২ সালে দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী ম্যাকডোনাল্ড সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এই প্রস্তাবে প্রাদেশিক আইনসভাগুলিতে প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য মুসলিম, শিখ, ভারতীয় খ্রীষ্টান, অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান এবং ইউরোপীয়ানদের জন্য পৃথক নির্বাচন প্রচলন করার কথা বলা হয়[১]। আসলে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থেই ব্রিটিশরা চায়নি যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনেও সাম্রাজ্যবাদী শাসকের এই কৌশল লক্ষ্য করা যায়। এই আইনে কংগ্রেসের দাবিমাফিক পূর্ণ স্বাধীনতা সম্পর্কে কোন আশ্বাস তো ছিলই না উপরন্তু ভারতবর্ষকে ডোমিনিয়ন স্টেটাসের মর্যাদা দেবার কথাও বলা হয়নি। এতে বলা হয়েছিল যে ফেডারেল রাষ্ট্রের আইনসভা দুটি ব্যবস্থাপক সভার সমন্বয়ে গঠিত হবে। উচ্চ কক্ষের মোট সদস্য হবে ২৬০ জন এবং নিম্ন কক্ষের সদস্য হবেন ৩৭৫ জন যার মধ্যে ১২৫টি আসন সংরক্ষিত থাকবে দেশীয় রাজ্যগুলির জন্য।

সেই সময় কেন্দ্রীয় আইনসভায় কংগ্রেসের ৪৪ জন সদস্য ছিল। অন্য সদস্যদের মধ্যে কংগ্রেস ন্যাশনালিস্ট পার্টি ১, ইনডিপেনডেন্ট পার্টি ২২, ইউরোপীয়ান - ১১, প্রশাসনিক

পদাধিকারী - ২৬, এবং বেসরকারী ব্যক্তি ১৩ জন। মহম্মদ আলি জিন্না ছিলেন ইনডিপেনডেন্ট পার্টির নেতা। কংগ্রেসের আনা ভারত শাসন আইন বাতিলের প্রস্তাব কেন্দ্রীয় আইনসভায় ৭২-৬১ ভোটে পরাজিত হয়[১১]। জিন্না কংগ্রেসের সঙ্গে একমত হতে না পারায় কংগ্রেসের প্রস্তাব বাতিল হয়ে যায়। কংগ্রেস, ইনডিপেনডেন্ট পার্টি, হিন্দু মহাসভা প্রত্যেকেই আলাদা আলাদা কারণে বিলটিকে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেনি। তথাপি ১৯৩৭ সালে আইনটি কার্যকর হয়।

১৯৩৭ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন অনুযায়ী। ঐ আইনে অখণ্ড বঙ্গের ২,১৫,৭০,৪০৭ জন হিন্দুর (যার মধ্যে ৯১,২৪,৯২৫ জন অনুন্নত তপশীলি শ্রেণীর হিন্দু) জন্য আসন দেওয়া হয়েছিল ৭৮টি আর ২,৭৪,৯৭,৬২৪ জন মুসলমানের জন্য আসন নির্ধারিত হয়েছিল ১১৭টি। অন্যদিকে ২০,৮৯৫ জন ইউরোপীয়র জন্য ১১টি, ২৭,৫৭৩ জন অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানের জন্য ৩টি এবং ১,২৯,১৩৪ জন ভারতীয় খ্রীষ্টানের জন্য ২টি আসন সংরক্ষিত ছিল। হিন্দুরা পেয়েছিল প্রতি ২,৭৬,৫৪৪ জনে একজন প্রতিনিধি আর মুসলমানেরা পেয়েছিল ২,৩৫,০২২ জন পিছু একজন প্রতিনিধি। অর্থাৎ সংখ্যানুপাতে হিন্দুদের প্রতিনিধি ছিল মুসলমানদের চেয়ে কম। তবে এই বৈষম্য ইউরোপীয় ও তার অন্য সহযোগীদের তুলনায় কিছুই নয়। প্রতি ১,৯০০ জন ইউরোপীয় পিছু নির্দিষ্ট হয়েছিল একজন প্রতিনিধি। অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানদের ক্ষেত্রে সংখ্যাটি ছিল ৯,১৯১ আর ভারতীয় খ্রীষ্টানদের ক্ষেত্রে সংখ্যাটি ছিল ৬৪,৫৬৭। তবে ব্যবসা বাণিজ্য ও জমিদারদের জন্য সংরক্ষিত আসনে হিন্দুদের প্রতিনিধিত্ব ছিল বেশী। ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ১জন মুসলিম প্রতিনিধির জায়গায় ৪জন হিন্দু প্রতিনিধির আসন নির্দিষ্ট ছিল। আর যেহেতু অবিভক্ত বঙ্গের বেশীরভাগ জমিদারই ছিল হিন্দু তাই জমিদারদের জন্য সংরক্ষিত ৫টি আসনও কার্যত হিন্দুদের জন্যই নির্দিষ্ট হয়েছিল। বলাই বাহুল্যমাত্র এইভাবে আসন নির্দিষ্ট হওয়ায় হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই তাদের জনসংখ্যার তুলনায় কম আসন পেয়েছিল।[১১]

১৯৩৭ সালের বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচনটি বাংলার ইতিহাসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা এই নির্বাচনের সাথে সাথেই বাংলার রাজনীতিতে মুসলমানদের একচেটিয়া প্রাধান্য স্থাপিত হয়। তবে মজার কথা এই প্রাধান্য কিন্তু মুসলিম লীগের দ্বারা স্থাপিত হয়নি। ফজলুল হকের কৃষক প্রজা পার্টি ছিল এর পেছনে। বাংলার অধিকাংশ জমিদারই ছিলেন হিন্দু আর প্রজাদের অধিকাংশই ছিলেন হতদরিদ্র মুসলমান। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুবাদে জমিদারদের অত্যাচার প্রজাদের অবস্থা শোচনীয় করে তুলেছিল। প্রজাদের মধ্যেকার অসন্তোষ কাজে লাগিয়ে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য তৈরী হচ্ছিল প্রজাসম্মিলনী। এভাবেই গড়ে ওঠে বরিশাল প্রজা সম্মিলনী (১৯২২), ঢাকা প্রজা সম্মিলনী (১৯২৪), জামালপুর প্রজা সম্মিলনী (১৯২৪) ইত্যাদি। ১৯২৯ সালে কলকাতায় স্যার আবদুর রহিমের নেতৃত্বে গড়ে ওঠে নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি। সমিতির সভাপতি হন স্বয়ং আবদুর রহিম আর কর্মসচিব নির্বাচিত হন আক্রাম খাঁ। ফজলুল হক ছিলেন সমিতির অন্যতম সহ সভাপতি।

১৯৩৫ সালে আবদুর রহিম কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি নির্বাচিত হলে সমিতির সভাপতি হন ফজলুল হক। ১৯৩৬ সালে সমিতির ঢাকা অধিবেশনে সমিতিতে কৃষকদেরও সামিল করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং সমিতির নতুন নাম হয় কৃষক প্রজা পার্টি।[১২]

বাংলার রাজনীতিতে তখন বেশ কয়েকটি মুসলমান স্বার্থরক্ষাকারী দলের উপস্থিতি। ১৯৩২ সালে মূলত অবাঙালী মুসলমানেরা এম এইচ এ ইস্পাহানী, আবদুর রহমান সিদ্দিকী প্রমুখের নেতৃত্বে গড়ে ওঠে নিউ মজলিশ পার্টি। ১৯৩৬ সালের এপ্রিল মাসে খাজা নাজিমুদ্দিন হাসান শহীদ সুরাবর্দি প্রমুখ বাঙালী অভিজাত মুসলমানেরা গড়ে তোলেন ইউনাইটেড মুসলিম পার্টি। ১৯৩৬ সালেই বিলাত থেকে দেশে ফিরে আসেন মহম্মদ আলী জিন্না। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনকে সামনে রেখে মুসলিম ভোটকে সংহত করতে বোম্বাইতে (অধুনা মুম্বাই) সর্বভারতীয় মুসলিম পরিষদের সভায় মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় নির্বাচন সংস্থা গঠিত হয়। বাংলায় প্রদেশিক মুসলিম লীগ নির্বাচনী সংস্থা গড়ার লক্ষ্যে ১৯৩৬ সালের ১৮ই আগষ্ট মজলিশ পার্টির ইস্পাহানীর ডাকে জিন্না কলকাতায় আসেন। ইস্পাহানীর বাড়িতে মজলিশ পার্টি, ইউনাইটেড মুসলিম পার্টি আর কৃষক প্রজা পার্টির প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনায় বসলেন জিন্না। কৃষক প্রজা পার্টির বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারী উচ্ছেদ বিষয়ে মতৈক্য না হলেও তিনটি দলই মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারী বোর্ডে যোগ দেয়। কিন্তু ৮ই সেপ্টেম্বর (১৯৩৬) বোর্ডের প্রথম সভাতেই ঐক্য ভেস্তে যায় এবং ফজলুক হকের নেতৃত্বে কৃষক প্রজা পার্টি আলাদাভাবে নির্বাচনে লড়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। কৃষক প্রজা পার্টির মূল আপত্তি ছিল যে বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারী উচ্ছেদের ব্যাপারে বোর্ড তো কোন প্রতিশ্রুতি দেয়ই নি তার উপরে তারা কৃষক প্রজা পার্টির স্বতন্ত্র অস্তিত্বেরও বিরোধী। ফজলুক হক বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করলেন যে মুসলিম ভোট সংহত করার নামে জিন্না বাংলার রাজনীতিতে অবাঙালী মুসলমানদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছেন। স্বাধীনচেতা ফজলুল হকের পক্ষে এসব মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না — ফলে শুরুতেই ঐক্য ভেস্তে গেল এবং নির্বাচনী লড়াই ছড়িয়ে গেল যুযুধান তিনটি শিবিরের মধ্যে। বিনাশর্তে জমিদারী উচ্ছেদ, মহাজনী কারবার নিয়ন্ত্রণ, ঋণ সালিশী বোর্ড প্রতিষ্ঠা, প্রশাসনিক ব্যয় হ্রাস, পূর্ণ প্রাদেশিক স্বায়ত্ত্বশাসন, রাজবন্দীদের মুক্তি এইসব দাবী ও প্রতিশ্রুতি নিয়ে ফজলুক হকের কৃষক প্রজা পার্টি নির্বাচনী যুদ্ধে নামল।[১৩]

নির্বাচনের ফল প্রকাশিত হলে দেখা গেল যে কংগ্রেস ৬০ টি আসন জিতে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। লীগ পেয়েছে ৪০টি আসন আর কৃষক প্রজা পার্টি পেয়েছে ৩৫টি আসন। নির্দলীয় মুসলমানেরাও দখল করেছে ৪২টি আসন। ত্রিপুরা কৃষক সমিতির ৫ প্রতিনিধির সমর্থন ছিল ফজলুল হকের দিকে। এই নির্বাচনে মুসলিম লীগ বোর্ড বেশী আসন পেলেও শতাংশের বিচারে তারা কৃষক প্রজা পার্টির চেয়ে কম ভোট পেয়েছিল। লীগ পেয়েছিল বাংলার মোট মুসলমান ভোটের ২৭.১০ শতাংশ অন্যদিকে কৃষক প্রজা পার্টি পেয়েছিল ৩১.৭৮ শতাংশ ভোট[১৪]। ঐ নির্বাচনে কৃষক প্রজা পার্টি আশাতীত সাফল্য পেলেও তাদের সাফল্য ছিল গ্রামাঞ্চলে সীমাবদ্ধ। শহরাঞ্চলে তাদের ফল ছিল

খুবই খারাপ। মুর্শিদাবাদে কৃষক প্রজা পার্টির তেমন কোন প্রভাব ছিল না, এখান থেকে তারা কোন আসন জেতেও নি। মুর্শিদাবাদ জেলার ৬টি আসনের মধ্যে দুটি দখল করে কংগ্রেস, তিনটি মুসলিম লীগ এবং একটি হিন্দু মহাসভা সমর্থিত নির্দল প্রার্থী।

১৯৩৭ সালের নির্বাচনের ফলাফলে দেখা যায় যে, কংগ্রেস অধিকাংশ প্রদেশে সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করলেও মুসলিম জনগণ তাদের সেভাবে সমর্থন করেনি। কংগ্রেস ৮৩৬ টি অমুসলিম আসনের ৭১৫ টিতে জয়লাভ করে, অন্যদিকে ৪৮৫টি মুসলিম আসনের ৮৫ টিতে লড়াই করে মাত্র ২৬ টি আসন কংগ্রেস দখল করতে সক্ষম হয়। বাংলার ১১৯ টি আসনের মধ্যে মুসলিম লীগ পায় ৪০ টি আসন। এই নির্বাচনে দেখা গিয়েছিল মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশেই মুসলিম লীগের ফলাফল তুলনামূলকভাবে খারাপ অন্যদিকে হিন্দুপ্রধান এলাকাগুলোতে তাদের ফলাফল বেশ ভালো।

১৯৩৭ সালটি মুর্শিদাবাদের ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা, পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী সমন্বিত নির্বাচনী ব্যবস্থা, মুসলিম লীগের নিরন্তর কংগ্রেস বিরোধী প্রচার জেলার সাধারণ মুসলিম অধিবাসীদের ভালোমতন প্রভাবিত করেছিল। ১৯২৯ সালের মার্চ মাসে জিন্নার পেশ করা ১৪ দফা দাবি নিয়ে মুসলিম লীগ জেলার রাজনীতি সরগরম করেই রেখেছিল তবে জেলায় মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িক প্রচার চূড়ান্ত জায়গায় পৌছায় ১৯৩৭ সালে। ওই বৎসর মুসলিম লীগের রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজের কুমার হোস্টেলের মাঠে। ওই সভায় মহম্মদ আলি জিন্না তাঁর ভাষণে বলেন, "কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের নীতির মধ্যে মৌলিক পার্থক্য হল এই যে, আমরা (মুসলিম লীগ) জোরের সাথে দাবী করি যে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা (Communal Award) কখনই পরিবর্তন করা উচিত নয়, যতক্ষণ না পর্যন্ত একটি চুক্তির ভিত্তিতে তা করা হবে। আমরা দৃঢ়তার সাথে দাবী করছি যে আগামী দিনে ভারতবর্ষে যে সংবিধান রচিত হবে, তা যার দ্বারাই রচিত হোক না কেন, সেখানে যেন মুসলমানদের অধিকার ও স্বার্থ যথাযথভাবে সুরক্ষিত হয়।" মুসলিম লীগের লড়াই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে জিন্না বলেন, "আমরা কেন মুসলমানদের জন্য লড়াই করছি? যদি মুসলমানগণ এই লড়াইয়ে পরাজিত হয়, তাহলে ভারতবর্ষের বুকে মুসলমানগণ ধ্বংস হয়ে যাবে। আমরা আমাদের ধর্ম সংস্কৃতি বা ভাষা নিয়ে যত ইচ্ছা কথা বলতে পারি, কিন্তু রাজনৈতিক শক্তি হল এমন একটি শক্তি যা আমাদের ধর্ম, সংস্কৃতি ও ভাষাকে সুরক্ষিত করবে। এই জন্যই আমরা লড়াই করছি।[১৫]"

সর্বভারতীয় নেতৃত্বের এইরকম নগ্ন সাম্প্রদায়িক প্রচারে জেলার মুসলিম লীগ সমর্থকেরা রীতিমতো চাঙ্গা হয়ে ওঠে এবং সুপরিকল্পিতভাবে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা বাড়াতে থাকে। দীর্ঘদিন পাশাপাশি শান্তিতে বাস করা প্রতিবেশীর সম্পর্কও বিষিয়ে গেল নেতাদের প্ররোচনামূলক উত্তেজক ভাষণে। মুসলিম লীগের মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির সাপ্তাহিক কাগজ 'ইসলাম জ্যোতি' - ও ক্রমাগত হিন্দু বিরোধী খবর ছেপে মুসলিম জনসাধারণকে উত্তেজিত করতে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

১৯৩৭ সালে বহরমপুরে মুসলিম লীগ অধিবেশনটি আরেকটি কারণেও বিশেষ

গুরুত্বপূর্ণ। ওই অধিবেশনই ছিল পরবর্তী কালের মুসলিম লীগ জাতীয় রক্ষীবাহিনীর সূতিকাগার। এই রক্ষীবাহিনীই পরবর্তীকালে মুসলিম লীগের হয়ে কংগ্রেস ও হিন্দুরোধী প্রচার করেছে, নির্বাচনে পেশীশক্তির প্রদর্শনী করেছে। সর্বোপরি নানা রকমের দাঙ্গা হাঙ্গামায়ও সক্রিয় অংশ নিয়েছে। এক কথায় পাকিস্তান সৃষ্টির কাজে প্রধান সহায়ক ছিল এই রক্ষীবাহিনী।[১৬]

১৯৩৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগের হতাশাজনক ফলের পরিপ্রেক্ষিতে জিন্না দলের সাংগঠনিক শক্তিকে দৃঢ় করার জন্য একটি সুসংগঠিত সুশৃঙ্খল কর্মীবাহিনীর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। ঐ বছরেই লীগের লক্ষ্মৌ অধিবেশনে কংগ্রেস সেবাদল বা খুদাই-খিদমতগার এর মতো লীগেরও একটি কর্মী বাহিনী গড়ে তোলার কথা বলা হয়। অক্টোবর মাসে বহরমপুরের লীগ অধিবেশনে জনৈক ফজলুল হক বার্কলের নেতৃত্বে প্রায় একশ মুসলমান যুবক জিন্নাকে গার্ড অব অনার দেয়না। এতে প্রীত হয়ে জিন্না ফজলুল হককে এইসব যুবকদের নিয়ে একটি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়ে তোলার পরামর্শ দেন যারা মুসলমান স্বার্থ ও অধিকার রক্ষায় ব্রতী হবে। সেই মতো গঠিত হয় জাতীয় রক্ষিবাহিনী। তৈরী হয় নিজস্ব উর্দি। লীগ আয়োজিত নানা সভা সমিতি, মিছিল, ব্যালী, বিক্ষোভ সমাবেশে এরাই থাকত পুরোভাগে। 'প্রজা লীগ সরকারের সমর্থনে জনসভার আয়োজন, জনমত গঠন তথা হিন্দু প্রধান কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক অপপ্রচার এদের কার্যকলাপের প্রধান অঙ্গ হয়ে উঠেছিল।

১৯৩৭ সালের আগে মুর্শিদাবাদ জেলায় সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা বা দাঙ্গা হাঙ্গামার তেমন কোন খবর পাওয়া যায় না। শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা থেকে জানা যায় যে ১৯৩৩ সালে বেলডাঙ্গায় এক সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা দেখা দেয়। পাশাপাশি অবস্থিত মন্দির ও মসজিদের অবস্থান নিয়ে ঐ গন্ডগোলের সূচনা হয়েছিল। ঐ বছরের ৭ই জুলাই একদল উত্তেজিত মুসলমান ডাক বাংলোয় অবস্থানরত পদস্থ সরকারী কর্মচারীদের ঘেরাও করলে উত্তেজনা চরমে ওঠে। পরিস্থিতি আয়ত্বে আনতে পুলিশ ঘেরাওকারীদের উপর গুলি চালায়। এর ফলশ্রুতিতেই দাঙ্গার সূত্রপাত হয়। হিন্দুদের ১০০টির মতো বাড়ী লুণ্ঠিত হয় এবং বেশ কিছু সংখ্যক ব্যক্তি আহত হন[১৮]

১৯৩৭ পরবর্তী মুর্শিদাবাদে কয়েকটি সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার ঘটনা ঘটেছিল যা থেকে দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়া আশ্চর্যের ছিল না। এরকমই একটা ঘটনা ঘটেছিল ১৯৪০ সালে। ওই বছর কালিয়াগঞ্জের মহরমের মিছিলের কিছু উৎশৃঙ্খল জনতা হিন্দুদের দোকান লুট করে এবং ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে। পুলিশও আক্রান্ত হয় তাদের হাতে। দায়িত্বপ্রাপ্ত সাব ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট গুলি চালানোর আদেশ দিতে বাধ্য হন। পুলিশের গুলিচালনায় তিনজনের মৃত্যু হয় এবং আহত হয় আরো ১১ জন[১৯]।

১৯৩৯ সালে হরিহরপাড়া থানার খিদিরপুর গ্রামেও গো-কোরবানী নিয়ে ব্যাপক সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল যা আদালত পর্যন্ত গড়িয়েছিল। হিন্দু জমিদার কালাচাঁদ রায়ের বিরুদ্ধে আদালতে লড়াই করার জন্য লিফলেট ছড়িয়ে মুসলিম ভাইদের কাছে

অর্থসাহায্যের আবেদনও জানানো হয়েছিল। 'করুণ আবেদন' শীর্ষক ঐ প্রচার পত্রটি এম এস এইচ মণ্ডলাবক্স নদবী ও মোহাঃ তাবারকউল্লাহ-র নামে প্রচারিত হয়। ১লা কার্ত্তিক ১৩৪৬ সালে প্রচারিত ঐ প্রচারপত্রটি ছাপা হয়েছিল ভাবতার দি রয়েল প্রিন্টিং প্রেস থেকে।

১৯৪২ সালে জঙ্গীপুর মহকুমার সূতী থানার বংশবাটী গ্রামে রাজ রাজেশ্বরীর মূর্তি বিসর্জন নিয়ে দারুণ ও সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা দেখা দেয়। প্রতিমা বিসর্জনের শোভাযাত্রা ঘিরে জন্ম নেওয়া সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা মহকুমা শাসকের এক আদেশানুযায়ী (৯ই ফেব্রুয়ারী) প্রশমিত হয়। মহকুমা শাসকের বেঁধে দেওয়া শর্ত মেনে শান্তিতে প্রতিমা বিসর্জন হয় কিন্তু পরের বছর (১৯৪৩) আবার একই রকমের গোলমাল দেখা দেয়। তৎকালীন মহকুমা শাসক (ইনি ছিলেন ইসলাম ধর্মাবলম্বী) পূর্বতন মহকুমা শাসকের আদেশ বাতিল করে ২৭শে ফেব্রুয়ারী এক নতুন আদেশ জারী করেন যা জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। জেলা সমাহর্তার সময়োচিত হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি আয়ত্বে আসে। বিষয়টি প্রাদেশিক মন্ত্রীসভার গোচরে এলে তারা অতুল কুমার ও নবাবজাদা নাসরুল্লাকে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করে তাদের উপর বিষয়টি তদন্তের ভার দেন। কমিটি ওই সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার পিছনে মহকুমা শাসকের প্রত্যক্ষ উস্কানীর প্রমাণ পেয়েছিল। এর ফলশ্রুতিতে ঐ মহকুমা শাসককে বদলী করা হয় কিন্তু সরকারের প্রভাব শালী মহলের সঙ্গে তার দহরম মহরম থাকায় তিনি ঐ বদলীর আদেশ বাতিল করাতে সমর্থ হন। শশাঙ্কশেখর সান্যাল ও নলিনাক্ষ্য সান্যাল বিধানসভায় এই ঘটনা তুলে ধরেন ও সরকারের একাংশের সাম্প্রদায়িক আচরণ নগ্ন হয়ে যায়। ওই কালপর্বেও হরিহরপাড়াতেও একই রকমের সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা দেখা দিয়েছিল যা বড়োসড়ো দাঙ্গার রূপ নিতে পারত। প্রশাসনিক তৎপরতায় এবং দুপক্ষের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের কার্যকরী হস্তক্ষেপে সেরকম কোন দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটেনি।

মুসলিম লীগ যখন হিন্দুবিরোধী প্রচারে পরিবেশ বিষিয়ে তুলছিল তখন হিন্দু মহাসভাও নিশ্চুপ বসে ছিল না। তারাও জেলায় জোরদার সংগঠন গড়ে তুলবার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল। তবে নিরক্ষর অশিক্ষিত সাধারণ মুসলিমদের যত সহজে ধর্মের জিগির দিয়ে মুসলিম লীগের পতাকাতলে আনা সম্ভব হচ্ছিল হিন্দু মহাসভার ক্ষেত্রে সেই কাজটা অত সহজ ছিল না। শিক্ষিত হিন্দু সম্প্রদায় তো বটেই অশিক্ষিত হিন্দু জনসাধারণও হিন্দু মহাসভার চেয়ে কংগ্রেসকেই বেশী পছন্দ করত এবং কংগ্রেসের পতাকাতলেই সমবেত হয়ে তারা স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নিত।

মুসলিম লীগ এবং হিন্দু মহাসভার পরস্পর বিরোধী এবং প্ররোচনামূলক রাজনীতির বাইরেও ছিল এক ধরণের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ যারা হিন্দু মুসলমানের ঐক্যের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদী নেতাদের মধ্যে বৈকুণ্ঠনাথ সেন, ব্রজভূষণ গুপ্ত, শ্যামাপদ ভট্টাচার্য, দুর্গাশঙ্কর শুকুল, তারাপদ গুপ্ত, বিজয় কুমার ঘোষাল, সনৎ রাহা, মৌলভী আবদুস সামাদ, রেজাউল করিম প্রমুখের নাম এক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এইসব নেতারা ছাড়াও আরেকজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ইনি হলেন মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুর ওয়াসিফ আলি মির্জা। জিন্না যখন, মুর্শিদাবাদের মাটিতে দাঁড়িয়ে তীব্র সাম্প্রদায়িক

প্রচার চালিয়ে গেলেন তখন নবাব বাহাদুর উদ্যোগী হলেন হিন্দু মুসলমান ঐক্য স্থাপনের জন্য। তাঁরই উদ্যোগে ১৯৩৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় হিন্দু মুসলমান ঐক্য সমিতি। তিনি ছিলেন এই সমিতির সভাপতি। ১৯৩৮ সালে এই সমিতির আহ্বানে লালবাগের হাজার দুয়ারীর মাঠে এক বিশাল হিন্দু মুসলমান ঐক্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের আহ্বায়ক ছিলেন রায়বাহাদুর সুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ। জেলার মুসলিম লীগ নেতারা 'মিলন চক্র ধ্বংস হোক' শ্লোগান তুলে সম্মেলন পন্ড করার জন্য গ্রামে গ্রামে প্রচার চালিয়েছিলেন। নবাব বাহাদুরও তাঁর পুরো এস্টেটকে এই সম্মেলন সফল করার জন্য কাজে লাগিয়ে ছিলেন। নবাব বাহাদুর ছাড়াও ওই সম্মেলনে বক্তাদের মধ্যে ছিলেন এ কে ফজলুল হক, সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, তুলশী গোস্বামী, হুমায়ন কবীর, সৈয়দ বদরুদ্দোজা, বি সি চ্যাটার্জী, আবদুস সামাদ প্রমুখ উদারপন্থী জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ[১০]। মুসলিম লীগের প্রত্যক্ষ বিরোধিতা সত্ত্বেও জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে হাজার হাজার মানুষ ওই সম্মেলনে উপস্থিত হয়ে সম্মেলনটিকে সফল করে তোলেন। নবাব বাহাদুর ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য হিন্দু মুসলমানের বিভেদ ভুলে সকলকে এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানান। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে হিন্দু মুসলমানের ঐক্য এবং পারস্পরিক আস্থায় এক ঐক্যবদ্ধ সমৃদ্ধ ভারত গড়ে উঠবে। মুর্শিদাবাদের সেই অশান্ত দিনগুলিতে নবাব বাহাদুরের ভূমিকা ছিল জাগ্রত বিবেকের মতো যা আজো শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখের দাবী রাখে।

১৯৩৭ সালের নির্বাচনের ভিত্তিতে বাংলায় প্রাদেশিক সরকার গঠনের সময় দেখা দিল জটিলতা। কংগ্রেস জানিয়ে দিল যে যেসব প্রদেশে তারা নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি সেখানে তারা অন্য কোন দলের সঙ্গে মন্ত্রীসভা গঠন করবে না। কংগ্রেসের এই সিদ্ধান্তের পিছনে মৌলানা আবুল কালাম আজাদের বিশেষ ভূমিকা ছিল। বাংলার ছোটলাট এমতাবস্থায় ফজলুল হককে সরকার গঠনের জন্য আমন্ত্রণ জানালেন; কিন্তু ফজলুল হকের সরকার গড়ার মতো সমর্থন কোথায়? অগত্যা তিনি কংগ্রেসের সহযোগিতা চাইলেন। এ বিষয়ে কংগ্রেসের সঙ্গে কৃষক প্রজা পার্টির আলোচনা চালান ফজলুল হকের বিশেষ আস্থাভাজন সৈয়দ বদরুদ্দোজা[১১] ও আরো অনেকে। প্রবীণ সাংবাদিক সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত তাঁর বইয়ে এ ব্যাপারে আলোকপাত করেছেন। সৈয়দ বদরুদ্দোজা ছিলেন মুর্শিদাবাদ জেলার লোক। কংগ্রেস নেতা শরৎচন্দ্র বসু ছিলেন তাঁর সহপাঠী। শরৎচন্দ্র বসু বদরুদ্দোজা মারফত হক সাহেবের প্রস্তাব শুনেও সর্বভারতীয় নেতৃত্বের বাধ্যবাধকতার জন্য কৃষক প্রজা পার্টিকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করতে পারেননি। আবুল মনসুর আহমেদ জানাচ্ছেন যে বন্দীমুক্তির প্রশ্ন নিয়ে জটিলতা দেখা দেওয়ায় কৃষক প্রজা পার্টি ও কংগ্রেসের আলোচনা ভেস্তে যায়। আলোচনা সভায় শ্রী আহমদ হাজির ছিলেন এবং তিনি বন্দীমুক্তির চেয়ে কৃষক প্রজার স্বার্থে প্রজাস্বত্ত্ব সংশোধনের মতো কাজকে অগ্রাধিকার দিতে চান। তাঁর বক্তব্য ছিল যে রাজনৈতিক বন্দীমুক্তির প্রশ্নে লাটসাহেব ভেটো প্রয়োগ করলে মন্ত্রীসভাকে পদত্যাগ করতে হবে। যার অর্থ কৃষক প্রজা পার্টি তার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি মতো প্রজার স্বার্থে কোন আইন পাশ না করেই পদত্যাগ করতে বাধ্য হবে। কাজেই তিনি বন্দীমুক্তির প্রসঙ্গটা অগ্রাধিকারের তালিকায়

শেষের দিকে রাখতে পরামর্শ দেন। কংগ্রেস নেতারা এই প্রস্তাব না মানায় দু'পক্ষের আলোচনা ভেস্তে যায়[২২]। কালীপদ বিশ্বাস তার 'যুক্ত বাংলার শেষ অধ্যায়' বইয়ে অবশ্য আলোচনা ভেস্তে যাওয়ার কারণ হিসাবে ফজলুল হকের প্রস্তাবিত মন্ত্রীসভায় নলিনী সরকারের অন্তর্ভূক্তিকে দায়ী করেছেন[২৩]। নলিনী সরকারকে মন্ত্রী করার ব্যাপারে কংগ্রেসের একাংশের তীব্র আপত্তি ছিল অন্যদিকে ফজলুল হকও শ্রী সরকারকে মন্ত্রী করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন। আবুল মনসুর আহমেদের সাক্ষ্যানুযায়ী স্রেফ নীতিগত কারণে কৃষক প্রজার স্বার্থকে রাজনৈতিক বন্দীমুক্তির চেয়ে অগ্রাধিকার দেবার কারণে কংগ্রেসের সঙ্গে কৃষক প্রজা পার্টির আপোষ হয়নি। তবে কৃষক প্রজা পার্টির পরবর্তী কার্যকলাপে এই দাবির সারবত্তা নিয়ে সন্দেহ জাগে। কৃষক প্রজা পার্টি ও লীগ যৌথ মন্ত্রীসভায় ১১ জন মন্ত্রীর মধ্যে ৯ জন জমিদার কিভাবে স্থান পেলেন সে প্রশ্ন ওঠা খুবই স্বাভাবিক। জে. এন. দে'র একটি গবেষণা পত্রে উল্লেখ করা হয়েছে যে বাংলার মুসলিম সমাজের অবিসংবাদী নেতা হবার লক্ষ্যে ফজলুল হকের কাছে কংগ্রেসের চেয়ে মুসলিম লীগই বেশী গ্রহণযোগ্য ছিল কেননা কংগ্রেস প্রজা পার্টি যৌথ মন্ত্রীসভা হলে ফজলুল হকের পক্ষে নিজেকে মুসলিমদের একচ্ছত্র নেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা মুশকিল হয়ে যেত[২৪] তাই শ্রী হক সেই ঝুঁকি নিতে চাননি — এ যুক্তি কখনোই উড়িয়ে দেবার নয়।

কংগ্রেসের সঙ্গে কৃষক প্রজা পার্টির সরকার গঠন নিয়ে আলোচনায় মুসলিম লীগ উৎকণ্ঠিত ছিল। তারা জানত যে বাংলায় কৃষক প্রজা পার্টি ও কংগ্রেসের যৌথ মন্ত্রীসভা হলে বাংলার মুসলিম রাজনীতিতে মুসলিম লীগের আধিপত্য বিস্তার করা অসম্ভব হবে। সর্বোপরি ফজলুল হক যদি তাঁর নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিসমূহ পালন করতে পারেন তবে তাঁর জনপ্রিয়তার সঙ্গে কোন মতেই টক্কর নেওয়া যাবে না। কাজেই কংগ্রেসের সঙ্গে আলোচনা ভেস্তে যেতেই সাগ্রহে এগিয়ে এল লীগ। ১৯৩৭ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারী লীগপন্থী কাগজ 'স্টার অফ ইণ্ডিয়া'র খবরে জানা গেল যে মুসলিম লীগ ও কৃষক প্রজা পার্টি যৌথভাবে সরকার গড়তে চলেছে। ঠিক ছিল যে ফজলুল হকের প্রস্তাবিত মন্ত্রীসভায় মুসলমান প্রতিনিধি থাকবেন ৬ জন, যার মধ্যে ৩ জন থাকবেন কৃষক প্রজা পার্টি থেকে আর ৩ জন থাকবেন লীগ থেকে। সেইমত কৃষক প্রজা পার্টির ফজলুল হক, নওসের আলি ও শামসুদ্দিন এবং মুসলিম লীগের হাবিবুল্লাহ, নাজিমুদ্দিন ও সুরাবর্দি এবং ৫জন হিন্দু মন্ত্রীর নাম ছোটলাটের অনুমোদনের জন্য তাঁর কাছে পাঠানো হয়। ছোটলাট প্রজা পার্টির শামসুদ্দিনের নাম মন্ত্রীর তালিকা থেকে কেটে সেখানে মুসলিম লীগের মোশারফ হোসেনের নাম ঢুকিয়ে দিলেন। মন্ত্রীসভায় ফজলুল হক ছাড়া প্রজা পার্টির মাত্র দু' জন প্রতিনিধি রইল আর লীগের প্রতিনিধি দাঁড়াল ৪জন অর্থাৎ প্রথম থেকেই মন্ত্রীসভায় লীগের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হ'ল[২৫]। হকের মন্ত্রীসভায় নাজিমুদ্দিন পেলেন স্বরাষ্ট্র, হাবিবুল্লাহ পেলেন কৃষি ও শিল্প, সুরাবর্দি পেলেন শ্রম ও শিল্প, মোশারফ হোসেন পেলেন আইন ও বিচার, নওসের আলি পেলেন স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন দপ্তরের ভার। প্রধানমন্ত্রী (তখন মুখ্যমন্ত্রী না বলে প্রধানমন্ত্রীই বলা হ'ত) ফজলুল হক নিজের হাতে রাখলেন শিক্ষা দপ্তর। হিন্দু মন্ত্রীদের মধ্যে নলিনীরঞ্জন সরকার পেলেন অর্থ, বিজয়প্রসাদ সিংহরায় পেলেন রাজস্ব, শ্রীশচন্দ্র নন্দী পেলেন যোগাযোগ ও পূর্ত, পি. দেব

রায়কত পেলেন আবগারী ও বন এবং এম বি মল্লিক পেলেন সমবায় ঋণ ও গ্রামীণ দায়বদ্ধতা বিভাগের ভার। ফজলুল হকের মন্ত্রীসভায় মুর্শিদাবাদের একমাত্র প্রতিনিধি ছিলেন কাশিমবাজারের মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দী।

মন্ত্রীসভায় জমিদারদের আধিক্য (১১জনের মধ্যে ৯জন) ও শামসুদ্দিনের স্থান না পাওয়ায় কৃষক প্রজা পার্টির একাংশ ক্ষুব্ধ হয়েছিল। এরপর নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি রক্ষায় ব্যর্থ হলে সেই ক্ষোভ আরো বাড়ে। জমিদারী উচ্ছেদের মতো কৃষক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মন্ত্রীসভার মনোভাবে বিরক্ত হয়ে শামসুদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বে কৃষক প্রজা পার্টির ২০জন নির্বাচিত প্রতিনিধি ফজলুল হকের বিরুদ্ধে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের অভিযোগ এনে প্রকাশ্য বিবৃতি দেন।

বিদ্রোহীদের বাগে আনতে না পেরে ১লা সেপ্টেম্বর কৃষক প্রজা পার্টির বিধায়কদের একটি সভা ডেকে ফজলুল হক ১৭জন সদস্যকে বহিষ্কার করেন[২৬]। এই বহিষ্কার মন্ত্রীসভার মধ্যে মুসলিম লীগের নিয়ন্ত্রণ বাড়িয়ে দেয় এবং কৃষক প্রজার স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় আসা ফজলুল হকের মন্ত্রীসভা আসলে বণিক জমিদার সামন্ত প্রভুদের সরকারে পরিণত হয়। এই অবস্থায় কংগ্রেসের কাছ থেকেও প্রত্যাশিত সাহায্য না পাওয়ায় ১৯৩৭ সালের ১৫ই অক্টোবর লক্ষ্ণৌতে মুসলিম লীগের বার্ষিক অধিবেশনে ফজলুল হক মুসলিম লীগে যোগ দেবার কথা ঘোষণা করেন[২৭]।

ফলে লীগ চলে এল মন্ত্রীসভার নেতৃত্বে। শুরু হ'ল লীগের রাজত্ব। ফজলুল হক মুসলিম লীগে যোগ দেওয়ার সাথে সাথে বাংলার রাজনীতিতে লীগের রমরমা শুরু হয়। ১৯৩৮ সালের ১১ই মার্চ তারিখে তমিজুদ্দিন খান তাঁর অনুগামীদের নিয়ে ইণ্ডিপেনডেন্ট প্রজা পার্টি গঠন করলেন[২৮]। এদিকে লীগ মন্ত্রীদের সঙ্গে অসহযোগিতার অভিযোগ তুলে ফজলুল হক মন্ত্রীসভায় কৃষক প্রজা পার্টির একমাত্র প্রতিনিধি স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন মন্ত্রী নওসের আলিকে পদত্যাগ করতে বলেন। নওসের আলি পদত্যাগ করতে অস্বীকার করলে গোটা মন্ত্রীসভা পদত্যাগ করে ও তাঁকে বাদ দিয়ে মন্ত্রীসভা পুনর্গঠিত হয়[২৯]।

১৯৩৭ সালের অক্টোবর মাসে লীগের লক্ষ্ণৌ অধিবেশন বাংলায় লীগের প্রভাব বিস্তার করার জন্য জিন্নার কাছে এক সুবর্ণ সুযোগ হাজির করে। সুযোগের সদ্ব্যবহারের জন্য জিন্না বাংলার প্রাদেশিক জেলা ও স্থানীয় শাখা গড়ে তোলার লক্ষ্যে ২০ সদস্যের একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠন করেন। এই কমিটির গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন মুর্শিদাবাদ জেলার লীগ নেতা সৈয়দ বদরুদ্দোজা[৩০]। লীগের প্রাদেশিক কমিটির সভাপতি হলেন ফজলুল হক আর সেক্রেটারী হলেন হাসান শহীদ সুরাবর্দি। ফজলুল হক সাংগঠনিক প্রধান হলেও কমিটিতে দলে ভারী ছিল অবাঙালী মুসলমান ব্যবসায়ী আর নবাব জমিদাররাই। এভাবেই বাংলার রাজনীতিতে অবাঙালী মুসলমানদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ফজলুল হকের কৃষক প্রজা পার্টির জনভিত্তি চলে আসে লীগের দখলে। ১৯৩৭ সালে মন্ত্রীসভা গঠনের তিন বছরের মধ্যে বাংলার সর্বত্র মুসলিম লীগের শাখা স্থাপিত হয়[৩১]।

কায়েমী স্বার্থের বণিক ও সামন্ত সম্প্রদায় মন্ত্রীসভার নিয়ন্ত্রক হয়ে দাঁড়ানোয় ফজলুল

হকের প্রজা স্বার্থ দেখার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পূরণের কোন উপায় রইল না উপরন্তু মন্ত্রীসভার কতকগুলি বিতর্কিত সিদ্ধান্ত নিয়ে ব্যাপক সোরগোল উঠল। ১৯৩৮ সালের ২৫শে আগষ্টের রেজোলিউশন অনুযায়ী সরকারী চাকরির ৬০ শতাংশ মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত করা হল। সরকারী চাকরির জন্য বাংলার অভ্যন্তরে যোগ্য মুসলমান প্রার্থী না মেলায় অন্য প্রদেশ থেকে শিক্ষিত মুসলমান এনে সরকারী চাকরিতে নিয়োগ করা হতে থাকল। এই নিয়ে কংগ্রেসের ললিত চন্দ্র দাস বিধানসভায় তীব্র প্রতিবাদ করলেন। তাঁর অভিযোগ অযোগ্য মুসলমান প্রার্থী নিয়োগ করে প্রশাসনের দক্ষতা হ্রাস করা তো হচ্ছেই তার উপরে অন্য প্রদেশ থেকে মুসলমান প্রার্থী এনে তাদের সরকারী চাকরি দেওয়ায় স্থানীয় যোগ্য অমুসলমান প্রার্থী বঞ্চিত হচ্ছে। মুসলিম লীগের সদস্য সৈয়দ মোয়াজ্জামুদ্দিন এর উত্তরে চাঁচাছোলাভাবে জবাব দিলেন যে অন্য প্রদেশ থেকে মুসলমান প্রার্থী এলেও তাতে বাংলার মুসলমানদের ভালোই হবে[২২]। প্রয়োজনে ভারতের বাইরে থেকেও যোগ্য মুসলমান প্রার্থী আনা হবে এবং সেটাই সরকারের পলিসি।

ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল বিল মারফত অন্যায্যভাবে কোলকাতা করপোরেশনে হিন্দুদের প্রতিনিধিত্ব কমিয়ে দেওয়া হ'ল। শিক্ষাক্ষেত্রেও এই সরকার এমন কিছু পদক্ষেপ নিল যা থেকে সাধারণ হিন্দুদের ধারণা হ'ল যে বর্তমান সরকার হিন্দু বিরোধী নীতি নিয়ে চলছে। সেকেণ্ডারী এডুকেশন বিল মারফত মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের হাত থেকে সরিয়ে নেওয়া হয় এবং সেকেণ্ডারী বোর্ডে মুসলমানদের কর্তৃত্ব স্থাপনের পাকাপোক্ত ব্যবস্থাও করে রাখা হ'ল এ বিলে। হিন্দুরা অভিযোগ তুলল বাংলার শিক্ষা-সংস্কৃতির ইসলামীকরণ করছে এই সরকার[২৩]।

১৯৩৮ সালের আগষ্ট মাসে কংগ্রেস ও বিদ্রোহী কৃষক প্রজা দল মন্ত্রী শ্রীশচন্দ্র নন্দীর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনে। ভোটাভুটিতে দেখা গেল সরকার পক্ষে ভোট পড়েছে ১৩০টি আর অনাস্থার পক্ষে ভোট পড়েছে ১১১টি। ২৩ জন ইউরোপীয় সদস্য সরকারের পক্ষে ভোট দেওয়ায় সরকার সেযাত্রা বেঁচে যায়। নভেম্বর মাসে তমিজুদ্দিন খান (ইন্ডিপেন্ডেন্ট প্রজা পার্টি) ও শামসুদ্দিন আহমেদকে মন্ত্রীসভার অন্তর্ভুক্ত করে ফজলুল হক মন্ত্রীসভার পিছনে সমর্থন বাড়ানোর চেষ্টা করেন[২৪]।

১৯৩৮ সালের ডিসেম্বর মাসে কংগ্রেস এক ঐতিহাসিক প্রস্তাবে নির্দেশ করে যে মুসলিম লীগ এবং হিন্দু মহাসভা দুটিই সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান[২৫] — যারা কংগ্রেসের নীতি আদর্শকে সম্মান করে না। অতএব কোন কংগ্রেসী এই দুটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হতে পারবেন না। এর আগে কংগ্রেসের অনেক নেতাই কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত থেকেই হিন্দু মহাসভা বা মুসলিম লীগের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতেন। কংগ্রেসের এই নির্দেশের ফলে সেইসব নেতার দু নৌকায় পা দিয়ে চলা বন্ধ হয়ে যায়। এ জেলায় হিন্দু জমিদার বা জোতদারেরা অনেকেই রাজশক্তির বিরাগভাজন হবার ভয়ে প্রকাশ্যে কংগ্রেসী রাজনীতি করতেন না। কংগ্রেসকে এড়িয়ে তারা হিন্দু মহাসভার সঙ্গে যুক্ত হতেন। এদের অনেকে কংগ্রেসী আদর্শে বিশ্বাসী হলেও স্রেফ নিজেদের স্বার্থরক্ষার তাগিদে হিন্দু মহাসভার পতাকাতলে অধিষ্ঠান

করতেন। তবে তারা যে সাধারণ হিন্দু জনসাধারণকে খুব বেশী প্রভাবিত করতে পারতেন তা মনে হয় না।

১৯৩৭ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে বিভিন্ন প্রাদেশিক মন্ত্রীসভা গঠিত হয়েছিল। ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ায় কতৃপক্ষ ঘোষণা করে যে ফেডারেশন গঠনের প্রস্তাব আপাতত মুলতবি থাকবে। সরকার মন্ত্রীসভাগুলির সঙ্গে কোন রকম আলোচনা বা পরামর্শ না করেই ভারতবর্ষকে যুদ্ধে জড়িয়ে দেয়। এর প্রতিবাদে অধিকাংশ কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা (প্রাদেশিক) পদত্যাগ করে। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে তেমন সুবিধা করতে না পারা মুসলিম লীগ এই সুযোগটিকে লুফে নেয় এবং ১৯৩৯ সালের ২২ শে ডিসেম্বর দিনটিকে তারা স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের লক্ষ্যে 'মুক্তি দিবস' হিসাবে পালনের ডাক দেয়[২৬]। সেই সময় অল ইণ্ডিয়া মুসলিম লীগের ওয়ার্কিং কমিটিতে ছিলেন বাংলার তিন প্রতিনিধি — ফজলুল হক, নাজিমুদ্দিন এবং এ. আর. সিদ্দিকি। মুক্তি দিবস পালন নিয়ে জিন্নার সঙ্গে মতানৈক্যের কারণে এ. আর. সিদ্দিকি ওয়ার্কিং কমিটি থেকে পদত্যাগ করেন। তার জায়গায় আক্রাম খাঁ মনোনীত হন[২৭]।

মুসলিম লীগ, হিন্দু মহাসভা ও কংগ্রেসের বাইরে চতুর্থ আরেকটি শক্তিও সেই সময়ে জেলার রাজনীতিতে সক্রিয় ছিল। সেটা ছিল বামপন্থী শক্তি। প্রথমদিকে কংগ্রেসের মধ্যে থেকেই কমিউনিস্টরা সমাজ পরিবর্তনের লক্ষ্যে কাজ করতেন। কংগ্রেসের মধ্যে থেকে উপদল হিসাবে কাজ করার সময় কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী অংশ বরাবরই এই কমিউনিস্টদের কোনঠাসা করার চেষ্টা করেছে। ১৯৩৬ সালে মুর্শিদাবাদ জেলায় কমিউনিস্ট লীগের জেলা শাখা গঠিত হয়[২৮]। সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নেতৃত্বাধীন এই দলের জেলার মুখ্য সংগঠক ছিলেন তারাপদ গুপ্ত। ১৯৩৭ সালের ৮-৯ মে বেলডাঙ্গা রেল ময়দানে তারা কৃষক সমাবেশ করেন, যে সমাবেশে বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। সত্যের খাতিরে স্বীকার করে নেওয়া ভালো সেই জমায়েতে প্রকৃত কৃষকদের সংখ্যা ছিল নগণ্য, শিক্ষিত মধবিত্ত শ্রেণীর প্রতিনিধিরাই বিপুল উৎসাহে ওই সমাবেশে যোগ দিয়ে সমাবেশকে সফল করে তোলে। ১৯৩৮ সালে জেলায় সি পি আই দলের প্রতিষ্ঠা হয়[২৯]। স্তালিন বিরোধী আরেকটি দল কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের ছত্রছায়ার বাইরে গিয়ে মার্কসবাদী চিন্তাভাবনা প্রাণিত হয়ে প্রথমে মার্কসবাদী অনুশীলন দল এবং পরবর্তী ক্ষেত্রে ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে আর এস পি দলের প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৩৯ সালের মার্চ মাসে নওদা থানার সর্বাঙ্গপুরেও একটি কৃষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৪৭ -এর আগে মুর্শিদাবাদে কমিউনিস্ট আন্দোলন মূলত ছাত্র ও কৃষক আন্দোলনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ফ্যাসীবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লড়াই -এ ছাত্র যুবদের একাংশকে সামিল করতে সক্ষম হলেও কমিউনিস্টরা সেই পর্বে তাদের আন্দোলনকে তুঙ্গে নিয়ে যেতে পারেনি যদিও তার ক্ষেত্র প্রস্তুত ছিলই।

প্রসঙ্গত বলে রাখা ভালো কমিউনিস্ট পার্টি প্রথমে জাতি সত্তার আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের তত্ত্ব মেনে মুসলিম লীগের পাকিস্তান প্রস্তাব সমর্থন করেছিল, কিন্তু পরে রজনী

পামে দ্যাট -এর যুক্তি অনুযায়ী মুসলিম লীগ সর্বশ্রেণীর মসলমান স্বার্থের প্রতিনিধি নয় উপরন্তু এটি একটি সামন্ততান্ত্রিক, প্রতিক্রিয়াশীল সাম্প্রদায়িক সংস্থা এই যুক্তিতে পাকিস্তান প্রস্তাব ও ভারতবিভাগের বিরোধিতা করে।

১৯৪০ সালে (২৪শে মার্চ) মুসলিম লীগ তার লাহোর অধিবেশনে দাবী তোলে যে ভারতবর্ষের মুসলিম প্রধান অঞ্চল গুলি নিয়ে পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করতে হবে। এর আগে বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন ব্যক্তি এমনকি মুসলিম লীগের নেতারাও দেশবিভাগের ব্যাপারে প্রচ্ছন্ন বা অস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছিলেন — সেই সমস্ত ইঙ্গিত স্পষ্ট হয়ে উঠল মুসলিম লীগ আনুষ্ঠানিকভাবে মুসলিমদের জন্য পৃথক রাষ্ট্র গঠনের দাবী তোলায়। ধূর্ত জিন্না বাংলার প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হককে দিয়ে এই প্রস্তাব উত্থাপন করান। প্রস্তাবে বলা হয়েছিল "...ভৌগোলিকভাবে লাগোয়া ভূখণ্ডগুলিকে এমন এক একটি অঞ্চল হিসাবে চিহ্নিত করতে হবে যে, যে সকল অঞ্চল মুসলিম অধ্যুষিত, যেমন ভারতের উত্তর-পশ্চিম এবং পূর্বাঞ্চল সেগুলিকে একত্রিত করে স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহে পরিণত করতে হবে যেখানে গঠনকারী একক গুলি হবে স্বাধীন ও সার্বভৌম[৪০]।" ফজলুল হককে দিয়ে এই প্রস্তাব উত্থাপন করানোর মধ্য দিয়ে কৌশলী জিন্না একই ঢিলে দুটো পাখি মারার ব্যবস্থা করেন। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে ফজলুল হকের এই প্রস্তাব সর্বাধিক গুরুত্ব পেয়েছিল, অন্য কেউ এ প্রস্তাব তুললে গণমাধ্যম বা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তা তেমন গুরুত্ব পেত না। আর এভাবেই ভবিষ্যতে পাকিস্তান প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বাংলার স্বাধীনচেতা মুসলিম নেতারা যাতে বেসুরে গাইতে না পারেন তা ব্যবস্থাও করে রাখা হয়।

ইতিমধ্যেই ব্রিটিশ শাসকদের প্রশ্রয়ে মুসলিম লীগ জাতীয় পর্যায়ে নিজেদের কংগ্রেসের সমান্তরাল সংগঠন হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে ফেলেছে। জিন্নাকেও ব্রিটিশরা তার প্রাপ্য গুরুত্বের চেয়ে অধিক গুরুত্ব দিয়ে গান্ধীজির সমকক্ষ করে তুলেছে। যদিও মুসলিম লীগ কংগ্রেসের মতো স্বাধীনতার আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে গণসংগঠনে পরিণত হয়নি তথাপি প্রাপ্য গুরুত্বের চেয়ে বেশী গুরুত্ব পেয়ে মুসলিম লীগ দেশব্যাপী তার প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ খুব স্পষ্ট করেই বলেছেন "... মুসলিম লীগের — পত্তনই হয়েছিল কংগ্রেসের পেছনে লাগার জন্যে, ... লীগে তাই তেমন কোনো সদস্যই ছিল না যে দেশের স্বাধীনতার জন্য লড়েছে। তারা কোনো ত্যাগ স্বীকার করে নি কিংবা কোনো সংগ্রামের নিয়মশৃঙ্খলার ভেতর দিয়ে যায় নি। তারা কেউ ছিল অবসরপ্রাপ্ত রাজ কর্মচারী, নয় এমন কোন লোক যাদের ব্রিটিশের পৃষ্ঠপোষকতায় জনজীবনে তুলে ধরা হয়েছিল[৪১]।"

ব্রিটিশরা ভালোমতই জানতে যে কংগ্রেসের শক্তিকে দুর্বল করতে গেলে বা তার গণআন্দোলন স্তব্ধ করতে গেলে দমনপীড়নের নীতি খুব বেশী কার্যকরী হবে না। অত্যধিক দমনপীড়ন চালালে তাতে আন্দোলনকারীর হাতই শক্ত হয় তাই তারা সুচতুরভাবে মুসলিম লীগ এবং তার উত্থাপিত সাম্প্রদায়িক দাবীগুলিকে প্রশ্রয় দিয়ে গেছিল। ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, "সরকার বুঝতে পেরেছিল যে কংগ্রেসের শক্তিকে দূর্বল করতে এবং তার অগ্রগতিকে বাধা দিতে হলে মুসলিম লীগকে এবং তার উত্থাপিত সাম্প্রদায়িক

দাবিগুলিকে প্রশ্রয় দিতে হবে। আর চরম আঘাত হানতে হলে দেশবিভাগের কথাই লীগকে দিয়ে বলাতে হবে[৩২]। মুসলিম লীগ নেতা ফিরোজ খাঁ নুন বলেছিলেন, 'কংগ্রেস বৃটিশ সরকারের সঙ্গে সংগ্রাম করে স্বাধীনতা আনবে, আমরা কংগ্রেসের সঙ্গে সংগ্রাম করে পাকিস্থান আনবো'[৩৩]। খালিকুজ্জামানের লেখা থেকে জানা গেছে যে দেশবিভাগের দাবী উত্থাপিত হবার আগেই লিনলিথগো জানতেন কি হতে চলেছে। বাদশা খাঁর ছেলে ওয়ালি খাঁ আরো স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন যে দেশবিভাগের প্রস্তাবটি লিনলিথগোর নির্দেশেই রচিত হয়েছিল[৩৪]।

১৯৪১ সালের শেষের দিকে বাংলার রাজনীতি এক নয়া মোড় নেয়। জিন্নার সঙ্গে আলোচনা না করে বড়লাটের কার্যনির্বাহী পরিষদে পাঞ্জাব, বাংলা ও আসামের প্রধান মন্ত্রীদের অন্তর্ভূক্ত করা হলে জিন্না কুপিত হন। এই নিয়ে মতবিরোধের জেরে ১৯৪১ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর লীগের সচিব লিয়াকত আলির কাছে এক চিঠি লিখে ফজলুল হক লীগের সভাপতিবে স্বেচ্ছাচারী আখ্যা দেন এবং জিন্নার অনুসৃত নীতি বাঙালী মুসলমানদের স্বার্থবিরোধী বলে অভিযোগ করেন। এর প্রতিবাদে ফজলুল হক জাতীয় প্রতিরক্ষা পরিষদের সাথে সাথে লীগ কমিটি থেকেও পদত্যাগ করেন। সুরাবর্দি প্রকাশ্য সভায় এ সব প্রসঙ্গে হকের সমালোচনা করলে অবস্থা ঘোরালো হয়ে দাঁড়ায় এবং শেষ পর্যন্ত অনাস্থা এড়ানোর জন্য ১লা ডিসেম্বর লীগের মন্ত্রীরা পদত্যাগ করে[৩৫]।

এই পরিস্থিতিতে ফজলুল হক, শরৎ বসু ও শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সহায়তায় প্রগ্রেসিভ অ্যাসেম্বলি পার্টি তৈরী করেন এবং ফরওয়ার্ড ব্লক, কৃষক প্রজা পার্টি, হিন্দু মহাসভা, তপশীলি ও অন্য কিছু বিধায়কের সমর্থন নিয়ে প্রগ্রেসিভ কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা গঠনের উদ্যোগ নিলেন। হিন্দু মহাসভার নেতা কৌশলী শ্যামাপ্রসাদের পরিকল্পনা ছিল ফজলুল হকের নেতৃত্বে গঠিত প্রস্তাবিত মন্ত্রীসভায় শরৎ বসু হবেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আর তিনি নেবেন অর্থ দপ্তরের ভার। কিন্তু জাতশত্রু সুভাষচন্দ্রের দাদা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হলে পলাতক সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে গোয়েন্দা দপ্তরের তৎপরতা চালানো অসম্ভব হবে এটা বুঝেই মন্ত্রীসভা গঠনের নির্দেশের দিনেই (১১ই ডিসেম্বর, ১৯৪১) শরৎ বসুকে ভারতরক্ষা আইনে গ্রেপ্তার করা হয়। যাই হোক সেই দিনই ফজলুল হকের নেতৃত্বে আর একটি নতুন মন্ত্রীসভা বাংলার দায়িত্ব নিল ইতিহাসে যা শ্যামা-হক মন্ত্রীসভা নামে খ্যাত[৩৬]।

ক্ষমতাচ্যুত মুসলিম লীগ মন্ত্রীরা ফজলুল হকের বিরুদ্ধে বিশ্বাস ঘাতকতার অভিযোগ আনলেন। জিন্না এই অভিযোগ খতিয়ে দেখে ফজলুল হককে লীগ থেকে বহিষ্কার করলেন[৩৭]। নাগপুরের সভায় মুসলিম লীগের ওয়ার্কিং কমিটি এই সিদ্ধান্ত অনুমোদন করল। জিন্না চেষ্টা করতে থাকলেন কিভাবে ফজলুল হককে হেয় করে মুসলিম লীগকে পুনরায় বাংলার তখতে আসীন করা যায়। জিন্নার এই কাজে সহায়ক হয় ইউরোপীয় বণিক গোষ্ঠী, অবাঙালী মুসলিম পুঁজিপতি ব্যবসায়ী আর প্রভাবশালী মুসলিম জমিদারদের একাংশ। ইউরোপীয়দের কাছে তাদের পুঁজির নিরাপত্তার জন্য ফজলুল হকের মতো স্বাধীনচেতার চেয়ে নাজিমুদ্দিনের মতো দূর্বল ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন প্রধানমন্ত্রী কাম্য ছিল। অবাঙালী মুসলমান ব্যবসায়ীরাও জানত

যে নাজিমুদ্দিনই তাদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল — তিনি কখনো তাদের বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান নিতে পারবেন না। অন্যদিকে ফজলুল হকের সঙ্গে ছোটলাট বা অন্য সিভিলিয়ানদের সম্পর্কও খুব ভালো ছিল না।

ইতিমধ্যেই দেশজুড়ে শুরু হয়ে গেছে আগষ্ট আন্দোলন। সারা দেশের সঙ্গে তাল মিলিয়ে মুর্শিদাবাদেও চলছে ভারত ছাড়ো আন্দোলনের কর্মসূচী। ১৯৪২ সালের ১৯শে আগষ্ট একদল উত্তেজিত ছাত্র জনতা বেলডাঙ্গা রেলওয়ে স্টেশন ও ডাকঘর আক্রমণ করে প্রচুর সরকারী সম্পত্তি নষ্ট করল। টেলিগ্রাফের তার কেটে, একটি রেল ইঞ্জিনের ক্ষতি করে, রেললাইনে কাঠের স্লিপার ফেলে তারা লঙ্কাকাণ্ড বাধিয়ে দিল। পরের দিনই আক্রান্ত হল শক্তিপুর ও রামপাড়ার গ্রামীণ ডাকঘর। ২৯শে আগষ্ট আক্রমণ হল পাটকাবাড়ী পোষ্ট অফিসের উপর। ৩রা সেপ্টেম্বর জ্বালিয়ে দেওয়া হল রুকুনপুর ডাকঘরের আসবাবপত্র ও কাগজসমূহ। বেলডাঙ্গা, জিয়াগঞ্জ, সারগাছি জঙ্গীপুর প্রভৃতি জায়গায় রিলিফ ক্যাম্প পুড়িয়ে দেওয়া, টেলিগ্রাফের তার কেটে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিনষ্ট করা, রেললাইনের ফিসপ্লেট খুলে রেল যোগাযোগ বিপর্যস্ত করা, সভা-সমিতি পিকেটিং বক্তৃতার মধ্য দিয়ে জেলায় ভারত ছাড়ো আন্দোলন চলতে থাকে[১৮]। তবে এ জেলায় ভারত ছাড়ো আন্দোলন তেমন জঙ্গ রূপ নেয়নি। পুলিশও তেমনভাবে আন্দোলনকারীদের উপর দমন-পীড়ন চালায়নি। পুলিশ প্রশাসনের এই কৌশলী চালে জেলায় আগষ্ট অন্দোলন তেমন তীব্র হতে পারেনি, যেমনটা হয়েছিল মেদিনীপুরে। নির্মম বলপ্রয়োগ, কঠোর দমননীতির ফলে মেদিনীপুরে ভারত ছাড়ো আন্দোলন এক অন্য মাত্রা পায়। ভারত ছাড়ো আন্দোলনে কাঁথি ও তমলুকে নির্মম পুলিশী অত্যাচার হক মন্ত্রীসভার সঙ্গে ছোটলাটের সম্পর্ক আরো বিষিয়ে তোলে। ঐ বিষয়ে ফজলুল হক বিচারবিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দিলে হার্বার্ট ১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৪৩ এক চিঠিতে জানান যে এসব তাঁর (হকের) এক্তিয়ারের বাইরে। পরের দিনই এর জবাবে ফজলুল হক আরো কড়া উত্তর দিলে দু'জনের সম্পর্কের আরো অবনতি হয়[১৯]।

এমনিতেই ফজলুল হক তখন রাজনৈতিকভাবে বেশ দুর্বল। ১৯৪২ সালের ২০শে নভেম্বর মন্ত্রীসভার অন্যতম স্তম্ভ শ্যামাপ্রসাদ পদত্যাগ করেছিলেন[২০]। তাঁর অভিযোগ ছিল মন্ত্রীদের পরামর্শ অগ্রাহ্য করে আমলারাই সরকার চালাচ্ছেন এমতাবস্থায় মন্ত্রী থাকার কোন যৌক্তিকতা নেই। অন্যদিকে লীগের ষড়যন্ত্র তো ছিলই। ১৯৪৩ এর ২৮শে মার্চ সর্বদলীয় মন্ত্রীসভা গঠনের ভাঁওতা দিয়ে ফজলুল হককে পদত্যাগ করতে বললেন হার্বার্ট[২১]। ফজলুল হক পদত্যাগ করেন কিন্তু ছোটলাট ও লীগের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করার লক্ষ্যে স্পীকার আইনসভা অনির্দিষ্ট কালের জন্য মুলতুবী করে দেন। পদত্যাগের সময়ে আইনসভায় ফজলুল হকের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল। এবার ছোটলাটের ইঙ্গিত পেয়ে নাজিমুদ্দিনের ব্যবসায়ীরা বন্ধুরা বিধায়ক কেনাবেচায় নামলেন। ২রা এপ্রিল জিন্নার একান্ত অনুগত ইসপাহানি জানাচ্ছেন যে নানারকম প্রলোভন দেখিয়ে পনের জন 'Cursed Muslim rascals' কে পক্ষে আনা গেছে[২২]। ইসপাহানি'র ভাষাটা লক্ষ্যণীয়। দাক্ষিণ্য বিতরণের জন্য ১১জনের জায়গায় ১৩ জন মন্ত্রী নিয়ে আর ১৬(!)টি নতুন পার্লামেন্টারী সচিবের পদ সৃষ্টি করে নাজিমুদ্দিন বাঁকাপথে

সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলেন। নাজিমুদ্দিনের মূল নির্ভরতা ছিল ইউরোপীয় সদস্য আর যোগেন্দ্রনাথ মন্ডলের তপশীলি সদস্যদের উপর। ৭জন মুসলমান আর ৬জন হিন্দু নিয়ে নাজিমুদ্দিন তার মন্ত্রীসভা গঠন করলেন ১৯৪৩ সালের ২৪ শে এপ্রিল[১৩]। প্রধানমন্ত্রীর হাতে রইল স্বরাষ্ট্র দপ্তর। অন্য যারা মন্ত্রী হলেন তারা হলেন — এইচ.এস. সুরাবর্দি (অসামরিক সরবরাহ), তমিজুদ্দিন খান (শিক্ষা), মোশারফ হোসেন (আইন ও বিচার), মৌলভী জালালুদ্দিন আহমদ (জনস্বাস্থ্য ও স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন), মোয়াজ্জামুদ্দিন হোসেন (কৃষি ও শিল্প), খাজা সাহাবুদ্দিন (শ্রম ও বাণিজ্য), তুলশী চন্দ্র গোস্বামী (অর্থ), বরদা প্রসন্ন পাইন (পূর্ত ও যোগাযোগ), তারক নাথ মুখার্জী (রাজস্ব) প্রেমহরি বর্মন (বন ও আবগারি) ও যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল (সমবায় ঋণ ও গ্রামীণ দায়বদ্ধতা)[১৪]।

সুরাবর্দির স্বপ্ন ছিল প্রধানমন্ত্রী হবেন তিনিই। কিন্তু ইউরোপীয় গোষ্ঠী ও অবাঙালী মুসলমান ব্যবসায়ীদের পৃষ্ঠপোষকতায় জিন্না নাজিমুদ্দিনের দিকে ঝোঁকায় সুরাবর্দির স্বপ্ন সফল হ'ল না। মন্ত্রীসভায় ঠাঁই পেলেও তিনি এবার তাই মন দিলেন দলের মধ্যে আধিপত্য বিস্তারে।

১৯৪৩ এর নভেম্বর এ অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক লীগের অধিবেশনে সুরাবর্দি দলের মধ্যে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করেন। দলের নতুন সচিব হলেন গোষ্ঠী নিরপেক্ষ লীগ নেতা আবুল হাশিম। নাজিমুদ্দিনের শাসনকালে বাংলার ভয়ংকর দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় এর দায়ভার এসে পড়ে তাঁর উপর। এরপর দেখা দেয় বস্ত্রাভাব। সুরাবর্দির মারোয়াড়ী ব্যবসায়ী বন্ধুরা নাজিমুদ্দিনকে লোকচক্ষুতে হেয় করতে কৃত্রিম বস্ত্রাভাব সৃষ্টি করে। ১৯৪৪ এর লীগ কাউন্সিলের অধিবেশনে নাজিমুদ্দিনের সঙ্গে সুরাবর্দির ঝামেলা চরমে পৌছাল। সুরাবর্দি শেষ পর্যন্ত হাশিমকে ঠেকাতে নাজিমুদ্দিনের সঙ্গে আপোষ রফা করলেন। তবু শেষ রক্ষা হলনা। নাজিমুদ্দিনের অনুগামী ২১ জন বিধায়ক তাঁর সঙ্গ ছাড়লেন। ১৯৪৫ সালের ২৮ শে মার্চ বিধানসভার ভোটাভুটিতে ৯৭-১০৬ ভোটে পরাস্ত হওয়ায় নাজিমুদ্দিন মন্ত্রীসভার পতন ঘটল[১৫]। ছোটলাট আর কাউকে মন্ত্রীসভা গঠন করতে না ডাকায় বাংলায় চালু হ'ল ছোটলাটের শাসন।

মুসলিম লীগের ক্রমবর্দ্ধমান সাম্প্রদায়িক প্রচারের মোকাবিলা করার জন্য হিন্দু মহাসভা ১৯৪২ সালের ১০ ই মে দিনটিকে পাকিস্তান বিরোধী এবং সারাভারত স্বাধীনতা দিবস হিসাবে পালন করে। তাদের সেদিনের গৃহীত প্রস্তাবের নির্যাস এই, ''আমরা অর্থাৎ হিন্দুরা আজ এই পবিত্র শপথ গ্রহণ করছি যে একটি সংহত জাতি ও কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্ররূপে হিন্দুস্তানের ঐক্য ভেঙে দিয়ে একটি স্বতন্ত্র পাকিস্তান ফেডারেশন গঠনের জন্য মুসলমানদের যে কোন প্রচেষ্টাকে আমরা বাধা দেব[১৬]।''

দেশবিভাগের প্রস্তাবটি মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে উত্থাপিত হবার পর দেশব্যাপী যে অশান্ত পরিবেশ সৃষ্টি হয় তার পরিপ্রেক্ষিতে মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুর ওয়াসিফ আলি মির্জা ১৯৪২ সালের ২০ শে জুন কলকাতায় হিন্দু মুসলমান ঐক্য সমিতির আরেকটি সম্মেলন আহ্বান করেন। স্বাগত ভাষণে এ কে ফজলুল হক ইসলাম ধর্মের শিক্ষা

বিষয়ে শ্রোতাদের অবহিত করে হিন্দু মুসলমানের ঐক্যের উপর জোর দেন। সভাপতির ভাষণে নবাব বাহাদুরও হিন্দু মুসলমানের ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে শ্রোতাদের অবহিত করেন। কোন সন্দেহ নাই কিছু বিছিন্ন ঘটনা ঘটলেও মুর্শিদাবাদ জেলায় যে বড় ধরণের কোন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ঘটনা ঘটেনি তার পিছনে নবাব বাহাদুরের একটা বড় ভূমিকা ছিল।

১৯৪২ -এর ভারত ছাড়ো আন্দোলনের তীব্রতা জিন্নার মনেও আলোড়ন তোলে। এর আগে মুসলিম লীগ কখনোই সেভাবে স্বাধীনতার দাবি তোলেনি। কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন স্বাধীনতা আন্দোলনে মুসলিম লীগের নেতৃত্বে দেশের মুসলমান জনসাধারণের এক বৃহৎ অংশ নীরব দর্শক ছিল। কিন্তু ৪২ -এর আন্দোলনের তীব্রতায় জিন্না ভাবতে বাধ্য হয়েছিলেন যে, দেশের এই উত্তাল পরিস্থিতিতে লীগের নেতৃত্বাধীন সাধারণ মুসলিমরা যদি স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশ না নেয় তবে তা খুবই খারাপ নজির সৃষ্টি করবে। সম্ভবত এই ধারণা থেকেই ১৯৪৩ সালে লীগের করাচি অধিবেশনে জিন্না তার দাবীর সঙ্গে স্বাধীনতার দাবীটিকেও যুক্ত করে নেন। অবশ্য তারও আগে একটা শর্ত ছিল। শর্তহীন স্বাধীনতা নয় জিন্না আওয়াজ তুলেছিলেন ভাগ করো এবং ভাগো (Devide & quit)[১৭]। সেই সময় দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির দ্রুত পটপরিবর্তন হচ্ছিল। মুসলিম লীগের নিত্য নতুন দাবী এবং নানা শর্ত আরোপে কংগ্রেসের তখন দিশাহারা অবস্থা। বস্তুত মুসলিম লীগের সঙ্গে আপোষ করার জন্য কংগ্রেস শিবিরের একাংশের চাপও ক্রমাগত বেড়েই চলছিল। ১৯৪২ সালের ২৩শে এপ্রিল রাজা গোপালাচারীর নেতৃত্বে মাদ্রাজ বিধানসভার কংগ্রেসী সদস্যেরা একটি প্রস্তাবে অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটিকে লীগের প্রস্তাব মেনে নিতে অনুরোধ করে[১৮] — প্রস্তাবটি যতই চমকপ্রদ হোক না কেন তা তিতিবিরক্ত কংগ্রেসীদের মনোভাব বুঝতে বিশেষ সহায়ক।

১৯৪২ সালে 'হরিজন' পত্রিকার জন্য লিখিত গান্ধীজির এক প্রবন্ধে এই রকমের ইঙ্গিত লক্ষ্য করা যায়। গান্ধিজী লিখেছিলেন, "যদি বেশিরভাগ মুসলমানেরাই নিজেদের হিন্দুদের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক এবং স্বতন্ত্র একটি জাতি হিসাবে মনে করেন এবং সেই কারণে দেশবিভাগ করতে চান তাহলে এই দেশ অনিবার্যভাবেই একদিন বিভক্ত হবে। অবশ্য হিন্দুরা তাদের এই প্রচেষ্টায় বাধা দিতে পারেন তবে সেক্ষেত্রে তাদের ইংরেজের বদলে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে এবং সেক্ষেত্রে ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির আশা সুদূর পরাহত হয়ে থাকবে[১৯]।"

সম্ভবত ঘটনার গতি প্রকৃতি দেখে গান্ধীজিও দেশবিভাগের অনিবার্যতা বুঝতে পারছিলেন। কাজেই যে গান্ধীজি একদিন দেশবিভাগের কট্টর বিরোধী ছিলেন যিনি বলেছিলেন যে তিনি বেঁচে থাকতে দেশবিভাগ হতে দেবেন না এবং কংগ্রেসকেও এই প্রস্তাব গ্রহণ করা থেকে বিরত করে যাবেন[২০], একমাত্র তাঁর মৃতদেহ মাড়িয়েই কংগ্রেস এই প্রস্তাবে সম্মত হতে পারবে, তিনিও দূত মারফত (জুলাই ১৯৪৪) এবং নিজেও (২৪ শে সেপ্টেম্বর ১৯৪৪) লীগের কাছে সন্ধিপ্রস্তাব উত্থাপন করেন[২১] — যদিও মদগর্বী জিন্না সেই প্রস্তাব প্রত্যাখান করেছিলেন।

দেশবিভাগের ক্রান্তিকালে মুর্শিদাবাদ

১৯৪৫ সালে নভেম্বর মাসে বহরমপুর সৈদাবাদ কুঠি বাড়ীতে হিন্দু মহাসভার জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। মহারাজ কুমার শ্রীশচন্দ্র নন্দী এই সম্মেলন উদ্বোধন করেন। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন ব্যারিষ্টার এন সি চ্যাটার্জী। বিশিষ্ট বক্তাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কলকাতার বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যক্ষ জে কে চৌধুরী, সারা ভারত হিন্দু মহাসভার সাধারণ সম্পাদক আশুতোষ লাহিড়ী প্রমুখ[২২]। এই সম্মেলনে মুসলিম লীগের ক্রমবর্দ্ধমান সাম্প্রদায়িক ক্রিয়াকর্মের পরিপ্রেক্ষিতে হিন্দু মহাসভার নীতি ও কর্মসূচী কি হওয়া উচিত তা নিয়ে আলোচনা হয়।

এরই মধ্যে ১৯৪৫ সালের নভেম্বর মাসে কেন্দ্রীয় আইন সভার আর ১৯৪৬ সালের মার্চ মাসে প্রাদেশিক বিধানসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ল। কংগ্রেস পূর্ণ স্বরাজের দাবী তুলে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে আর মুসলিম লীগ নির্বাচনে অংশ নেয় পাকিস্থানের দাবীতে। নির্বাচনে মুসলিম লীগ আশাতীত সাফল্য লাভ করে। কেন্দ্রীয় আইন সভার সবকটি (৩০) মুসলিম আসনই মুসলিম লীগের দখলে যায়। তারা দখল করে মুসলিম ভোটদাতাদের প্রায় ৮৯% ভোট। কংগ্রেস অমুসলিম ভোটদাতার ৯১ শতাংশের সমর্থন পেয়ে ৫৭টি আসন দখল করে[২৩]।

বাংলার প্রাদেশিক আইন সভার নির্বাচনে মুসলমান ভোট দখলের জন্য লড়ল লীগ আর কংগ্রেসের সমর্থনপুষ্ট হকের নেতৃত্বাধীন বেঙ্গল ন্যাশনালিস্ট মুসলিম পার্লামেন্টারী পার্টি। ১২৩ টি মুসলমান আসনের মধ্যে ১১৩টি দখল করল মুসলিম লীগ, ৮৭টি আসনে প্রতিদ্বন্দিতা করে বেঙ্গল ন্যাশনালিস্ট মুসলিম পার্লামেন্টারী পার্টি পেল মাত্র পাঁচটি আসন যার মধ্যে দুটিতে জয়ী হয়েছেন স্বয়ং ফজলুল হক। মুসলিম লীগ পেয়েছিল ২০,১৩,০০০ মুসলিম ভোট আর প্রতিপক্ষের সংগ্রহ মাত্র ২,৩২,১৩৪ ভোট[২৪]।

২৫০ সদস্য বিশিষ্ট বিধান পরিষদে মুসলিম লীগ ১১৫ টি আসন পেয়ে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাবে আত্মপ্রকাশ করল। কংগ্রেস পেল ৬২টি আসন[২৫]। আগের মুসলিম নেতৃত্বাধীন মন্ত্রীসভার গুলির বদনাম ছিল যে তারা হিন্দু বিরোধী ভূমিকা নিয়েছিল। লীগ নেতা সুরাবর্দি এবার কংগ্রেসের কাছে প্রস্তাব দিলেন কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা গড়ার জন্য। কিন্তু হাইকমান্ডের বাগড়ায় এবারও কোয়ালিশন গড়া গেল না। তবে সুরাবর্দি কতটা মনেপ্রাণে কংগ্রেসের সঙ্গে কোয়ালিশন চেয়েছিলেন তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই পারে। কেননা এরপরই সুরাবর্দি যে মন্ত্রীসভা গড়লেন তাতে স্থান পেলেন মাত্র তিনজন অকংগ্রেসী হিন্দু নেতা যা আগের হক, শ্যামা-হক বা নাজিমুদ্দিন মন্ত্রীসভায় হিন্দু মন্ত্রী সংখ্যার চেয়ে কম[২৬]।

ভারতবর্ষের সেই অশান্ত পরিবেশে ব্রিটিশ সরকারও ভারতবর্ষ থেকে হাত গুটিয়ে নিতে চাইছিল কিন্তু একই সঙ্গে তারা এটাও চাইছিল যে তাদের ভারত ত্যাগের পরও ভারতবর্ষে তাদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ যেন সুরক্ষিত থাকে। ভারতবর্ষে লগ্নী করা ব্রিটিশ পুঁজি যাতে কোন অসুবিধায় না পড়ে সেটা দেখা তাদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এই পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ সরকার ১৯৪৬ সালের ১৫ই মার্চ ভারতবর্ষে ক্যাবিনেট মিশন পাঠানোর কথা ঘোষণা করে। ওই ঘোষণা মাফিক ২৩ শে মার্চ (১৯৪৬) ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের তিন

জন সদস্য স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস, ভারত সচিব পেথিক লরেন্স এবং এ ভি আলেকজান্ডার ভারতবর্ষে এসে পৌছান[১৭]। ভারতবর্ষের ৭৪২ জন নেতার সঙ্গে ১৮২টি বৈঠক এবং সিমলায় কংগ্রেস, মুসলিম লীগ এবং সরকারের ত্রিপাক্ষিক বৈঠকেও কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের সমঝোতা সম্ভব না হওয়ায় ক্যাবিনেট মিশন তাদের নিজস্ব মতামত পেশ করে। ১৯৪৬ সালের ১৬ই মে সরকারীভাবে ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা ঘোষিত হয়।

ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাবে একটি ত্রিস্তরীয় কাঠামোর কথা বলা হয়েছিল। প্রস্তাবিত কাঠামোয় কেন্দ্র ছিল খুবই দুর্বল কেবলমাত্র বৈদেশিক সম্পর্ক, প্রতিরক্ষা আর যোগাযোগ থাকবে তার দায়িত্বে। তুলনায় প্রদেশগুলিকে শক্তিশালী করার চেষ্টা হয়েছিল। ঠিক হয়েছিল প্রদেশগুলিকে তিনটি গ্রুপে ভাগ করা হবে। গ্রুপ 'এ' তে থাকবে হিন্দু প্রধান প্রদেশগুলি। গ্রুপ 'বি' তে থাকবে পাঞ্জাব সহ উত্তর পশ্চিমের মুসলমান প্রধান প্রদেশগুলি আর গ্রুপ 'সি' তে থাকবে বাংলা সহ উত্তর পূর্বের মুসলমান প্রধান প্রদেশগুলি। গ্রুপগুলি নিজেদের আইন প্রণয়ন করতে পারবে। কোন কোন বিষয় যৌথ দায়িত্বে রাখা যায় সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার তাদের থাকবে। আর এই তিন গ্রুপের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত হবে কেন্দ্রীয় সংবিধান সভা।

নতুন সংবিধান রচিত হয়ে যাবার পর সেই সংবিধান অনুসারে প্রথম সাধারণ নির্বাচনের পর প্রাদেশিক বিধানসভা প্রয়োজনে তাকে যে গ্রুপে রাখা হয়েছিল সেই গ্রুপ থেকে বেরিয়ে যেতে পারবে।

সমতার ভিত্তিতে হিন্দু মুসলমান ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত কেন্দ্রীয় সংবিধান সভার উপর ভার থাকবে নতুন সংবিধান রচনার। এই সভায় কোন সম্প্রদায় কটি আসন পাবে তা স্থির হবে সেই সম্প্রদায়ের জনসংখ্যার অনুপাতে। সংবিধান সভায় নির্বাচিত প্রতিনিধিরা এ বি সি এই ভবে ভাগ হয়ে যাবেন। গ্রুপ, সংবিধান এবং গ্রুপের অধীনে কোন কোন বিষয় থাকবে, তা ঠিক হয়ে গেলে তিনটি গ্রুপ একসঙ্গে বসে কেন্দ্রীয় সংবিধান রচনা করবে। একটি অন্তবর্তীকালীন সরকারও গঠন করা হবে। মিশনের পরিকল্পনা অনুযায়ী সংবিধান রচিত হবার পর একটি স্থায়ী সরকার গঠন করে, তার হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে[১৮]।

কংগ্রেস এই পরিকল্পনায় খুশি হয়নি কেননা পরিকল্পনায় দুর্বল ইউনিয়ন গঠনের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল যার হাতে প্রতিরক্ষা, বিদেশ ও যোগাযোগ ছাড়া আর কোন দপ্তরের দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। প্রদেশগুলির হাতে অধিক ক্ষমতা দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। কংগ্রেসের সবচেয়ে বেশী আশঙ্কা ছিল যে ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনায় প্রদেশগুলিকে নানা ধর্মাবলম্বী অধিবাসীদের ভিত্তিতে নানা গ্রুপে ভাগ করার মধ্যে দিয়ে আসলে ভবিষ্যতে একটি মুসলিম রাজ্য গঠনের সম্ভাবনা জিইয়ে রাখা হয়েছিল। অন্যদিকে মুসলিম লীগের আপত্তি ছিল এই যে এই প্রস্তাবে স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রের স্বপ্নকে একেবারেই পাত্তা দেওয়া হয়নি। অবশ্য প্রথমে ওজর আপত্তি তুললেও মুসলীম লীগ ১৯৪৬ সালের ৬ই জুন এবং কংগ্রেস ২৫ শে জুন ক্যাবিনেট মিশনের পরিকল্পনায় সম্মতি দেয়[১৯]।

কিন্তু পরিস্থিতি ঘোরালো হয়ে দাঁড়ালো যখন ১০ই জুলাই বোম্বাইতে (অধুনা মুম্বাই) এক সাংবাদিক সম্মেলনে কংগ্রেস সভাপতি জহরলাল নেহেরু সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে জানালেন যে কংগ্রেস কেবলমাত্র সংবিধান সভায় যোগ দিতেই রাজী হয়েছে এবং প্রয়োজনে ক্যাবিনেট মিশনের ছক সে অদল বদল করে নিতে পারে[১০]। জিন্না ক্যাবিনেট মিশনের পরিকল্পনায় সম্মতি দেবার পর দলের অন্দরেই ব্যাপক সমালোচিত হয়েছিলেন। তাঁর সহকর্মীদের অভিযোগ ছিল যে পাকিস্থান দাবীর বিন্দুমাত্র স্বীকৃতি না থাকা সত্বেও তিনি মিশন পরিকল্পনায় সম্মতি জানিয়ে ভুল করেছেন। সমালোচনার ফলে জিন্না মিশন পরিকল্পনা থেকে সম্মানজনক ভাবে সম্মতি প্রত্যাহারের ফিকির খুঁজছিলেন। নেহেরুর ঐ মন্তব্য তাকে সুবর্ণ সুযোগ এনে। তিনি তৎক্ষণাৎ বিবৃতি দিয়ে জানালেন যে নেহেরুর এই ঘোষণার ফলে গোটা অবস্থার পুনর্বিবেচনা দরকার।

একথা বলাই বাহুল্যমাত্র যে আশু সংবিধান সভা গঠনের প্রয়োজনীয়তাই কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগকে ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনায় সম্মতিদানে বাধ্য করেছিল। সংবিধান সভা গঠনের প্রস্তাবে রাজী হবার পর সভার সদস্য নির্বাচনের জন্য ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা মোতাবেক কাজ শুরু করা হয় কিন্তু নির্বাচনে কংগ্রেসের বিপুল সংখ্যা গরিষ্ঠতায় (জিন্না'র ভাষায় Brute majority) ভীত হয়ে মুসলিম লীগ ১৯৪৬ সালের ২৯ শে জুলাই ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনায় তাদের পূর্ব সম্মতি প্রত্যাহার করে নেয়[১১] এবং ওই একই দিনে তাদের স্বাধীন স্বতন্ত্র পাকিস্তান আদায়ের লক্ষ্যে ১৬ই আগষ্ট থেকে প্রত্যক্ষসংগ্রাম (Direct action) শুরু করার হুমকি দেয়। একই সঙ্গে তারা তাদের প্রস্তাবিত স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্য একটি পৃথক সংবিধান সভা গঠন করার জন্যও দাবী জানান।

মুসলিম লীগের আহ্বানে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের নামে ১৬ই আগষ্ট (১৯৪৬) কলকাতায় বীভৎস দাঙ্গা শুরু হয় যা 'গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং' নামে আজো বিখ্যাত। সেই সময় বাংলার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন হাসান শহীদ সুরাবর্দি। সেই দাঙ্গার পিছনে সরকারের নীরব প্ররোচনার কথা আজ আর কোন নতুন কথা নয়। সেদিন বাংলায় ছুটি ঘোষণা করা হয়েছিল। অভিযোগ উঠেছিল যে দাঙ্গা শুরু হলে সুরাবর্দি পুলিশ কন্ট্রোলরুমের দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নিয়েছিলেন। সরকার এই অভিযোগ অস্বীকার করলেও পুলিশের পক্ষ থেকেও এই অভিযোগ উঠেছিল। সাংবাদিক শংকর ঘোষ তার লেখায় জানিয়েছেন যে তিনি নিজে ওই সময় সুরাবর্দিকে পুলিশ কন্ট্রোলরুমে অধিষ্ঠান করতে দেখেছিলেন[১২]। লীগের নেতারা ময়দানের সভায় অতি উত্তেজক বক্তৃতা দিয়ে জনগণকে প্ররোচিত করেন। ষষ্ঠ জর্জকে লেখা বড়লাটের মন্তব্য করা হয়েছিল লীগ নেতারা অত্যন্ত দায়িত্বজ্ঞানহীন বক্তৃতা দিয়েছেন ঃ Unwise speeches (to say the least)[১৩] বাংলার লীগ সভাপতি নাজিমুদ্দিন তো কোন অস্পষ্টতা না রেখে পরিস্কার ভাষায় বললেন যে আমাদের লড়াই কংগ্রেস আর হিন্দুদের বিরুদ্ধে[১৪]। আর জিন্না তো প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দিয়েছেন যে এখন আমাদের কাছে পিস্তল আছে আর আমরা তা ব্যবহার করার মতো অবস্থায় রয়েছি ঃ To-day we have also forged pistol and are in a position to use it.[১৫]

প্রত্যক্ষ সংগ্রামের প্রস্তুতি পর্বে এক দিকে যেমন নেতারা উত্তেজক বিবৃতি দিয়ে জনগণকে প্ররোচিত করছিলেন তেমনি অন্যদিকে বিলি করা হচ্ছিল উত্তেজক প্রচারপত্র যার বক্তব্যে কোন রাখঢাক ছিল না। একটি প্রচারপত্রে তরবারি হাতে জিন্নার ছবির সাথে বলা হয়েছিল 'আশা ছেড়ো না। তরোয়াল তুলে নাও। ওহে কাফের, তোমার ধ্বংসের দিন বেশি দূরে নয়।' আর একটি প্রচারপত্রের ভাষা এরকম, 'আল্লার ইচ্ছায় পাকিস্থান লাভের জন্য নিখিল ভারত মুসলিম লীগ এই রমজান মাস ঠিক করেছেন। ... এই রমজান মাসেই ইসলাম ও কাফেরদের মধ্যে প্রথম প্রকাশ্য যুদ্ধ শুরু হয়'[১৬]।

মুসলমানদের এই রণং দেহি মূর্তি হিন্দুদের আতঙ্কিত করে তোলে। শ্যামাপ্রসাদ ১৯৪৬ সালের ১০ই জানুয়ারি তাঁর ডায়েরীতে লিখেছিলেন 'Civil war আমরা চাই না কিন্তু যদি অপর পক্ষ তৈরী হয়ে ওঠে আর আমরা প্রস্তুত না থাকি, তাহলে আমরাই ঠকব শেষ পর্যন্ত।'[১৭] দাঙ্গা প্রতিরোধের জন্য হিন্দুরাও গোপনে প্রস্তুতি নিতে থাকে। তবে মুসলমানদের পক্ষে ছিল সরকার এবং পুলিশ প্রশাসন (ট্রেড ইউনিয়ন নেতা নীহারেন্দু দত্ত মজুমদারের অভিযোগ ছিল 'বাংলার সরকার লীগের সাব কমিটির মতো কাজ করছে।) গোয়েন্দা বিভাগের গোপন রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে লীগের মিছিলকারীদের নিয়ে যাবার জন্য করপোরেশনের গাড়ি ব্যবহার করা হয়েছিল। ধৃত গুন্ডাদের ছেড়ে দেবার জন সুরাবর্দি নিজে তৎপর হন। ময়দানের সভায় তিনি বুঝিয়ে দেন যে পুলিশকে নির্দেশ দেওয়া আছে, তারা হস্তক্ষেপ করবে না। লালবাজারে বিভিন্ন হিন্দু অঞ্চল থেকে ফোন আসা সত্ত্বেও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। অন্যদিকে হাঙ্গামা হতে পারে ধরে নিয়ে মুসলমানদের জন্য অ্যাম্বুলেন্স মজুদ রাখা হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রীর (সুরাবর্দি) গাড়িতে করে মিছিলকারীদের জন্য খাবার, অনান্য জিনিসপত্র এমনকি ছোরাছুরি পেট্রোল কেরোসিনও নিয়ে যাওয়া হয়[১৮]। সেই সময় সুরাবর্দির আরেকটি পদক্ষেপ নিয়ে পত্রপত্রিকায় ব্যাপক সমালোচনা হয়েছিল। দাঙ্গা দমনে সাহায্যের জন্য সুরাবর্দি পাঞ্জাব থেকে সশস্ত্র পুলিশের একটি দল আনিয়েছিলেন। অভিযোগ উঠেছিল যে কলকাতায় পর্যাপ্ত থাকা সত্ত্বেও সুরাবর্দির পাঞ্জাব থেকে পুলিশ আমদানির মূল কারণ এই যে পাঞ্জাব পুলিশের অধিকাংশই মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত। তারা দাঙ্গা দমনের নামে নির্লজ্জ সাম্প্রদায়িক আচরণের স্বাক্ষর রেখেছিল। মুসলিম লীগ অবশ্য দাঙ্গা দমনে ব্রিটিশ পুলিশ কমিশনারের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় সাহায্য না পাওয়ায় পাঞ্জাব থেকে পুলিশ আনতে হয়েছিল বলে সাফাই গেয়েছিল। ১৬ থেকে ২০ শে আগষ্ট পর্যন্ত পাঁচদিন পুরোদমে দাঙ্গা চলার পর অবস্থা আয়ত্তে এসেছিল।

কলকাতার দাঙ্গা নিয়ে বিধানসভায় সরকার ও বিরোধীপক্ষে তীব্র বাদানুবাদ হয়। পুলিশ প্রশাসন ও সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন বিরোধীরা। ফজলুল হক জানতে চান কোথায় কখন গোলমাল হবে পুলিশ যদি বুঝতে পেরে না থাকে, তবে তাদের মাইনে দিয়ে রাখা হয়েছে কেন? শ্যামাপ্রসাদের তীক্ষ্ম ভাষণে বিব্রত সুরাবর্দি পাল্টা আক্রমণে শ্যামাপ্রসাদকে গুন্ডা বলে অভিহিত করেন। শ্যামাপ্রসাদ প্রত্যুত্তরে বলেন আমি গুন্ডা হতে পারি; কিন্তু আপনি হলেন গুন্ডাদের সর্দার — The princes of Gundas.[১৯]

অন্নদাশংকর রায়ও তার 'যুক্তবঙ্গের স্মৃতি'তে -এ সুরাবর্দিকে গুন্ডাদের মন্ত্রণাদাতা বলে অভিহিত করেছেন[৮০]। কমিউনিস্ট নেত্রী মণিকুন্তলা সেন লিখেছেন 'ডাইরেক্‌ট অ্যাকশনের জেনারেল ছিলেন সোহরাবর্দি'[৮১]। আরো স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন আনিসুজ্জামান, আমরা দেখিয়াছি ময়দানের সভায় যাইবার জন্য মিছিলকারী ও লীগওয়ালারা ছোরা ও লাঠিসহ সশস্ত্র হইয়া অবলীলাক্রমে রাস্তায় উভয় পার্শ্বস্থ হিন্দুর দোকান সমূহ লুণ্ঠন করিতে করিতে যাইতেছে। আমরা আর দেখিয়াছি, সশস্ত্র পুলিশ ইহা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিয়াছে আর মনের আনন্দে হাসিয়াছে।' তার অকপট স্বীকারোক্তি, 'একথা প্রত্যেক নিরপেক্ষ সজ্জন ব্যক্তি অকপটে স্বীকার করিবেন যে দাঙ্গার জন্য মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দই একমাত্র দায়ী[৮২]।

আত্মপক্ষ সমর্থন করতে গিয়ে সুরাবর্দি আইনসভায় বলেন যে দাঙ্গা করার কোন পরিকল্পনাই লীগের ছিলনা। থাকলে এত মুসলমান ঘরবাড়ি অরক্ষিত রেখে মিছিলে যেত না। আরেক লীগ নেতা ইস্পাহানী বলেন যে দাঙ্গা করার ইচ্ছা থাকলে তারা কলকাতাকে বেছে নিতেন না[৮৩]। কারণ কলকাতায় মুসলমানরা খুবই সংখ্যালঘু। কথাটা অবশ্য ভাববার মতো। কলকাতার মতো হিন্দু গরিষ্ঠ শহরকে লীগ কেন বেছে নিয়েছিল দাঙ্গার জন্য। এ প্রশ্নের উত্তর লুকিয়ে আছে তৎকালীন বাংলার রাজনৈতিক পটভূমিকায়। যদিও বাংলার প্রধান মন্ত্রী তখন এইচ এস সুরাবর্দি তবুও তিনি জিন্নার কাছের লোক নন। বাংলার রাজনীতিতে জিন্নার কাছের লোক ছিলেন নাজিমুদ্দিন আর তার অবাঙালী মুসলমান ব্যবসায়ী বন্ধু ইস্পাহানী ভ্রাতৃদ্বয় প্রমুখেরা। শুধু মাত্র জিন্নার কৃপাদৃষ্টিতে না থাকায় সুরাবর্দি প্রথম লীগ মন্ত্রীসভায় প্রধান মন্ত্রীত্ব পাননি। কাজেই তাঁর ছিল জিন্নার কাছে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করার তাগিদ একই সঙ্গে জিন্নার কাছের লোক হবার বাসনা। জিন্নার প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাককে সফল করে তিনি নিজের ক্ষমতা জাহির করতে চেয়েছিলেন একই সঙ্গে হতে চেয়েছিলেন জিন্নার কাছের লোক। কলকাতার দাঙ্গা যত সহজে সর্বভারতীয় গণমাধ্যমের নজর কাড়বে বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের দাঙ্গা তত সহজে তা পারবে না। নজরে পড়ার সেই সুযোগ সুরাবর্দি হারাতে চাননি। অন্নদাশংকর রায় যথার্থই বলেছেন, 'যে-ই রক্ষক সে-ই ভক্ষক! যাঁর হাতে পুলিশ তাঁর হাতেই গুন্ডা। প্রদেশের যিনি মুখ্যমন্ত্রী, গুন্ডাদেরও তিনি প্রধান মন্ত্রণাদাতা'[৮৪]। ১৯৪৬ সালের ৭ই এপ্রিল দিল্লীতে আইনসভাগুলির সদস্যদের এক সম্মেলনে সুরাবর্দির এই মনোভাবের প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবে মুসলমানদের জন্য পৃথক রাষ্ট্রসমূহের কথা বলা হয়েছিল। কৌশলী জিন্না ওই সম্মেলনে সুরাবর্দিকে দিয়ে প্রস্তাব উত্থাপন করিয়ে রাষ্ট্রসমূহ কথাটা সংশোধন করিয়ে রাষ্ট্র করেন। বাংলার লীগ নেতা আবুল হাশিম বিষয় কমিটিতে এই সংশোধনের বিরোধিতা করেন তাঁর বক্তব্য ছিল লীগ অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবের সংশোধন করার অধিকারী নয় এই সম্মেলন। তখন জিন্না বলেন যে স্টেট্‌স শব্দটি টাইপের ভুলে হয়েছে আসলে ওটা হবে স্টেট। কিন্তু আগের সব কাগজপত্র পরীক্ষা করে দেখা যায় যে সর্বত্রই স্টেট আছে। তখন জিন্না বলেন যে শব্দের জন্য কিছুই যায় আসে না, উদ্দেশ্যই হল লক্ষণীয় বিষয়[৮৫]। একই সঙ্গে জিন্না সর্বত্র স্টেটসকে স্টেট করার নির্দেশ দেন। বাংলার মুসলমানদের স্বার্থ বিরোধী (রাষ্ট্রসমূহ থাকলে বাংলাও

হত পৃথক রাষ্ট্রের দাবিদার) ওই প্রস্তাবটি সুরাবর্দিকে দিয়ে উত্থাপন করার মধ্য দিয়ে জিন্না এক সুচতুর চাল চেলেছিলেন। সুরাবর্দিও হয়তো তা বুঝতে পেরেছিলেন। কিন্তু তাঁর তখন জিন্নার প্রিয়পাত্র হবার তাগিদ, বাংলার মুসলমানদের কথা তাঁর না ভাবলেও চলবে!

কলকাতার পর দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে নোয়াখালিতে। গোলাম সারওয়ার নামক মুসলিম লীগের এক মৌলবাদী নেতার নেতৃত্বে সেখানে একতরফা ভাবে হিন্দুদের হত্যা করা হয়। হিন্দু মেয়েদের গণধর্ষণ করা হয় এবং ব্যাপক হারে হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করা হয় ১৬ই অক্টোবর বেঙ্গল প্রেস অ্যাডভাইসারি কমিটির রিপোর্টে দাঙ্গার যে বিবরণ পাওয়া যায় তা এইরকম ঃ হাজার হাজার গুন্ডা গ্রামবাসীদের উপর চড়াও হয়েছে, গো-হত্যা করেছে, গ্রামবাসীদের জোর করে গোমাংস খাইয়েছে এবং অনেক মেয়েকে হরণ করেছে বা জোর করে বিয়ে করেছে। এছাড়া ধর্মস্থানের উপর আঘাত এবং অসংখ্য গ্রাম জ্বালিয়ে দেওয়ার উল্লেখও ওই রিপোর্ট থেকে পাওয়া যায়[১৬]। মুসলিম লীগ এগুলিকে অতিরঞ্জিত প্রচার বলে উড়িয়ে দিলেও লীগ সরকারের মন্ত্রী সামসুদ্দিন আহমদ কড়া ভাষায় এই পরিকল্পিত দাঙ্গার নিন্দা করেছিলেন এবং স্বীকার করেছিলেন যে হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করা হয়েছে এবং নারীদের শ্লীলতাহানি করা হয়েছে[১৭]। এরপরই দাঙ্গা শুরু হয়ে যায় বিহার ও ত্রিপুরায়। সাম্প্রদায়িক উন্মত্ততা বীভৎস রূপ ধারণ করায় গান্ধীজী তাঁর বিখ্যাত নোয়াখালি পদযাত্রা শুরু করেন। সেই অশান্ত সময়ে মুর্শিদাবাদে চাপা উত্তেজনা থাকলেও এখানে তেমন কোন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামার ঘটনা ঘটেনি। দিল্লীর রাজনীতিতে তখন দ্রুত পটপরিবর্তন হচ্ছিল। দেশবিভাগ নিয়ে ইঙ্গিতও পাওয়া যাচ্ছিল। তাতে জেলার সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায় রীতিমতো শঙ্কিত হয়ে উঠছিল। কেননা দেশবিভাগ অবশ্যম্ভাবী হলে মুর্শিদাবাদের পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হওয়া ছিল প্রায় নিশ্চিত — এ বিষয়ে হিন্দু মুসলমান কারোর মনেই বিশেষ সংশয় ছিল না।

১৯৪৬ এর দাঙ্গায় যে দাঙ্গাবাজরা শুধু অন্য সম্প্রদায়ের মানুষদেরই আক্রমণ করেছিল তা কিন্তু নয়। স্বসম্প্রদায়ের উদারপন্থী নেতারাও দাঙ্গাবাজদের লক্ষ্য ছিল। তাদের অনেকেই স্বসম্প্রদায় ভুক্ত দাঙ্গাবাজদের হাতে নিগৃহীত হয়েছিলেন। কৃষক প্রজা পার্টির ফজলুল হককে জোর করে মুসলিম লীগের প্রতি আনুগত্য স্বীকারে বাধ্য করা হয়। বিধান সভার প্রাক্তন স্পীকার নওসের আলির সঙ্গেও একই রকমের দুর্ব্যবহার করা হয়। কংগ্রেস নেতা দার্শনিক রেজাউল করিমও এই দাঙ্গায় আক্রান্ত হন — তাঁর উরুর হাড় ভেঙে যায়[১৮]। জি এল মেহতার (গগনবিহারী লাল মেহতা — ইনি পরে আমেরিকায় ভারতীয় রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হয়েছিলেন।) বল্লভভাই প্যাটেলকে লেখা এক চিঠি থেকে জানা যায় যে, ১৬ই আগষ্টের জনসভায় নাকি স্পষ্ট বলা হয়েছিল যে, মুসলিম লীগকে এমন ব্যবস্থা নিতে হবে যাতে আট দিনের মধ্যে কোন জাতীয়তাবাদী মুসলিমের অস্তিত্ব না থাকে।[১৯] হয় তাদেরকে লীগের নীতি মেনে নিতে হবে নতুবা তাদের বাড়ীঘর লুট করে তাদের মারতে হবে। তাদের হুমকি যে নেহাৎ কথার কথা ছিল না তার প্রমাণ তারা রেখেছিল রেজাউল করিম, ফজলুল হক, নওসের আলি প্রমুখকে নিগৃহীত করে।

১৯৪৬ সালের ২রা সেপ্টেম্বর কেন্দ্রে অন্তর্বর্তীকালীন কংগ্রেসী সরকার শপথ নেয়।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেন সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল।[১০] ভাইসরয়ের অনুরোধে ওই বছরের অক্টোবর মাসে লীগও ওই অন্তবর্তী সরকারে যোগ দেয়[১১]। কিন্তু মন্ত্রীসভার যৌথ দায়িত্ব মেনে কাজ করার মানসিকতা লীগের ছিল না। তারা সরকারে থেকেও সম্ভাব্য সকল রকম উপায়ে সরকারের কাজে বাধা সৃষ্টি করতে থাকে।

মুসলিম লীগ অন্তবর্তী সরকারে যোগ দেওয়ায় কংগ্রেস ও ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের ধারণা হয়েছিল যে, এবার তারা সংবিধান সভাতেও যোগ দেবে কিন্তু সবাইকে অবাক করে লীগ সংবিধান সভায় যোগ না দেবার পূর্বসিদ্ধান্তে অটল থাকে। এরপর তারা তাদের প্রস্তাবিত পৃথক রাষ্ট্রের জন্যও আলাদা সংবিধান সভা তৈরির জন্য চাপ সৃষ্টি করতে থাকে।

ইতিমধ্যেই ওয়াভেল তার কুখ্যাত ব্রেকডাউন প্ল্যান ছকে ফেলেছেন এবং তার খসড়াও ভারত সচিবের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু নানা অসঙ্গতিতে ভরা এই পরিকল্পনা গ্রহণ করা ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের পক্ষে সম্ভব ছিল না উপরন্তু ভারতীয় রাজনীতিতে অনাবশ্যক নাক গলিয়ে পরিস্থিতি জটিল করে দেওয়ায় বিরক্ত হয়ে তাকে ভাইসরয় পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়।

১৯৪৭ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলি ব্রিটিশ হাউস অফ কমন্সে ঘোষণা করে জানালেন যে, হিজ ম্যাজেস্টিজ গভর্ণমেন্ট ভারতবর্ষের বর্তমান অনিশ্চয়তার অবস্থা আর চলতে দিতে পারেন না। এই পরিস্থিতিতে সরকার স্থির করেছেন যে, আগামী বছরের জুন মাসের মধ্যে তারা ভারতবর্ষের ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন।[১২] তবে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ যদি সংবিধান নিয়ে ঐক্যমত্যে পৌছাতে না পারে সেক্ষেত্রে হিজ ম্যাজেস্টিজ গভর্ণমেন্ট নিজেই একতরফাভাবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বাধ্য হবেন। সেই রকম পরিস্থিতিতে প্রয়োজন হলে বিভিন্ন অঞ্চলে ক্ষমতাসীন সরকারগুলির হাতে ক্ষমতা বন্টন করে দেওয়া হবে।

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর এই ঘোষণার উদ্দেশ্য ছিল সংবিধান নিয়ে ঐক্যমত্যে পৌছানোর জন্য কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের উপর সর্বাধিক চাপ সৃষ্টি করা। এমত পরিস্থিতিতে কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি ১৯৪৭ সালের ৮ই মার্চ সিদ্ধান্ত নেয় যে সংবিধান সভায় মুসলিম লীগ যোগ না দিলেও তারা (সংবিধান সভা) সারা ভারতের জন্যই সংবিধান রচনা করবে তবে কোন অঞ্চল যদি তা গ্রহণে অনিচ্ছুক হয় তবে তারা ভারত ইউনিয়ন থেকে বেরিয়ে যেতে পারে।[১৩] কংগ্রেসের এই রেজোলিউশান গ্রহণের সাথে সাথে মুসলিম লীগের মস্ত বড় জয় সাধিত হয়েছিল — কেননা এই প্রথম কংগ্রেস খাতায় কলমে দেশবিভাগ যে অনিবার্য তা মেনে নিয়েছিল।

১৯৪৭ সালের ২৪ শে মার্চ লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন শেষ ব্রিটিশ গভর্ণর জেনারেল হিসাবে কার্যভার গ্রহণ করেন। কার্যভার গ্রহণ করেই তিনি ১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যেই ক্ষমতা হস্তান্তরের লক্ষ্যে কাজে নেমে পড়েন। ভারতবর্ষের নানা রাজনৈতিক দলের নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে তিনি নিজের মতো করে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য একটি পরিকল্পনা রচনা করেন এবং তা অনুমোদনের জন্য লন্ডনে পাঠিয়ে দেন। ১০ই মে'র মধ্যে

কর্তৃপক্ষের অভিমত জানিয়ে দেবার জন্য তিনি বিশেষভাবে অনুরোধ করেছিলেন।[২৪] সামান্য পরিবর্তন ও পরিমার্জন সহ ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ পরিকল্পনাটি অনুমোদন করে। প্ল্যান বলকান নামে পরিচিত এই পরিকল্পনাটিতে রাজনৈতিক ক্ষমতার উত্তরাধিকারী হিসাবে ভারতবর্ষের বিপুল সংখ্যক রাজ্যগুলিকেই মেনে নিয়ে সেগুলিকে নিজেদের খেয়াল অনুযায়ী চলার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে এই অভিযোগে নেহেরু এই পরিকল্পনাটির তীব্র বিরোধিতা করেন। ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পিত প্ল্যান ইউনিয়ন বা মাউন্ট ব্যাটেনের মস্তিস্কপ্রসূত প্ল্যান বলকানের বিকল্প হিসাবে গান্ধীজিও আরেকটি প্রস্তাবের উল্লেখ করেছিলেন। এতে ভারতবর্ষকে অখণ্ড রাখার জন্য শর্তসাপেক্ষে জিন্নাকেই প্রথম অন্তবর্তী কালীন সরকার গঠনের সুযোগ দেবার কথা বলা হয়েছিল — বলা বাহুল্যমাত্র কংগ্রেসের বেশিরভাগ সদস্যই ছিলেন এই পরিকল্পনার বিরোধী।

ইতিমধ্যেই মাউন্ট ব্যাটেনের হাতে এসে যায় আরেকটি বিকল্প। ভারত সরকারের রিফর্ম কমিশনার ভি পি মেননের এই পরিকল্পনাটিতে দেশভাগের অনিবার্যতাকে মেনে নেওয়া হয়েছিল। পরিকল্পনা যখন নেহাৎ ভাবনার স্তরে তখন থেকেই সর্দার প্যাটেল পরিকল্পনাটি সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। মাউন্ট ব্যাটেনের পরামর্শে মেনন পরিকল্পনাটি নিয়ে নেহেরুর সঙ্গেও কথা বলেন। নেহেরুও পরিকল্পনাটা গ্রহণ করা যেতে পারে বলে মতামত দেন।

মেননের কাছে নেহেরুর মতামত শুনে মাউন্ট ব্যাটেন মেননকেই সম্ভাব্য চুক্তির বিষয়গুলি নিয়ে একটা খসড়া প্রস্তুতের অনুরোধ করেন। মেননের পরিকল্পনায় বলা হয়েছিল যে যদি দেশবিভাগ অবশ্যম্ভাবী হয় তবে প্রতিটি রাষ্ট্রের জন্য একটি করে কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করা হবে এবং তাদেরকে তাদের নিজস্ব সংবিধান সহ ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাসের ভিত্তিতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে। এজন্য ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনকে পরিমার্জিত করা হবে এবং প্রদেশগুলিকে ভাগ করার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষ একমত হলে সেই কাজ করার জন্য একটি সীমানা কমিশন গঠন করা হবে।

মেননের এই পরিকল্পনা কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও শিখ সমাজের নেতারা অনুমোদন করে এবং স্থির হয় এ বিষয়ে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট ৩রা জুন (১৯৪৭) একটি প্রকাশ্য বিবৃতি দেবেন। গভর্ণমেন্টের এই প্রকাশ্য বিবৃতির আগের দিন (২রা জুন, ১৯৪৭) ভাইসরয়ের প্রাসাদে একটি বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছিল। এই বৈঠকে কংগ্রেসের পক্ষে নেহেরু, প্যাটেল ও আচার্য কৃপালনী, মুসলিম লীগের পক্ষে মহম্মদ আলি জিন্না, আব্দুস রব নিস্তার, লিয়াকত আলি খান এবং শিখ সমাজের পক্ষে সর্দার বলদেব সিং হাজির ছিলেন। সরকারী প্রতিনিধিদের মধ্যে ছিলেন স্বয়ং ভাইসরয় লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন, লর্ড ইজমে, স্যার ই মেভিল ও লেফট্যানেন্ট কর্ণেল আর্সকিন ক্রাম।[২৫] এই বৈঠকে আনুষ্ঠানিকভাবে সম্পূর্ণ পরিকল্পনাটা সম্পর্কে দেশীয় নেতাদের অবহিত করে আরো একবার তাদের সম্মতি আদায় করে নেওয়া হয়েছিল।

১৯৪৭ সালের ৩রা জুন হিজ ম্যাজেস্টিজ গভর্ণমেন্টের পক্ষে প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলি

হাউস অফ কমন্সে এবং সেক্রেটারী অফ স্টেটস লিস্ট ওয়েল হাউস অফ লর্ডসে সরকারী বিবৃতি দেন যা ভারতবর্ষেও প্রচারিত হয়েছিল।[১৬] ৩রা জুন ভাইসরয় তার সান্ধ্য বেতার ভাষণে যা বলেন তার সারমর্ম হল এই যে, ক্যাবিনেট মিশনের পরিকল্পনাটিই উপমহাদেশের পক্ষে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য ছিল কেননা তাতে দেশ অখন্ড থাকত। মুসলিম লীগ দেশভাগ চাইছে। জিন্নার যুক্তি মেনেই কংগ্রেসও প্রদেশ ভাগ চাইছে। জিন্নার যুক্তি মেনে দেশভাগ করতে হলে কংগ্রেসের প্রদেশ ভাগের দাবীও উড়িয়ে দেওয়া যায়না। তবে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টকে যদি ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য সংবিধান প্রণয়ণের কাজ শেষ হওয়া পর্যন্ত অনির্দিষ্ট সময় অপেক্ষা করতে হয় তবে তার চেয়ে ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাসের ভিত্তিতে ক্ষমতা হস্তান্তর করাই বিধেয়। মাউন্ট ব্যাটেনের বেতার ভাষণের পর নেহেরুও জিন্না, বলদেব সিংহও বেতারে ভাষণ দেন এবং দেশবাসী নিশ্চিত হয়ে যায় যে দেশবিভাগ হচ্ছেই।

ওয়াকিবহাল মহল অবশ্য অনেক আগে থেকেই জানতেন যে দেশবিভাগ হবেই এবং সেক্ষেত্রে মুর্শিদাবাদ জেলা যে পাকিস্তানের ভাগে পড়ার সম্ভাবনা প্রবল তাও অনেকেই আশঙ্কা করেছিলেন। জেলার মুসলিম লীগ নেতারা খুবই আত্মপ্রত্যয়ী ছিলেন যে প্রদেশ ভাগ হোক বা না হোক মুর্শিদাবাদ জেলা পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছেই। জেলার হিন্দু সমাজ তথা জাতীয়তাবাদী নেতাদের মনেও যে এ আশঙ্কা ছিল না তা নয়। ১লা জুন (১৯৪৭) বহরমপুর গ্রান্ট হলে মুর্শিদাবাদ জাতীয় বঙ্গ সম্মেলনের এক সভায় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দীর ভাষণে সেই আশঙ্কাই প্রতিফলিত হয়েছিল। যদিও তিনি তার বক্তব্যে মুর্শিদাবাদের ভারতভুক্তির পক্ষেই সওয়াল করেছিলেন। শ্রীশনন্দী বলেন, "বর্তমান তথাকথিত গণতন্ত্রের ভিত্তিই হইল সংখ্যা অর্থাৎ জনসংখ্যা। কাজেই কথা উঠিয়াছে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল লইয়াই জাতীয় বঙ্গের প্রতিষ্ঠা হইবে। কিন্তু এ সম্পর্কে আমাদের দাবী জানাইবার পূর্বে একটা কথা বলিতে চাই। শুধু সংখ্যাই কি সব? শিক্ষা, সংস্কৃতি, বিদ্যা, বুদ্ধি, ঐশ্বর্য, বিত্ত এ সকল কিছুই নহে? যেখানে সরকারী তহবিলের অধিকাংশই আসে আমাদের ধনভান্ডার হইতে, যেখানে দেশের শিক্ষা মন্দিরের প্রায় প্রত্যেকটি আমাদের অর্থ সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত, বাঙ্গলার সংস্কৃতি এখনও যেখানে আমাদেরই প্রতিভার গৌরবময় দানে প্রধানতঃ পরিপুষ্ট সেখানে আমাদের এ সকল দানের কি কোন স্বতন্ত্র মূল্যই নির্দিষ্ট হইবে না? সেখানেও কি আমরা শুধুই সংখ্যা লঘিষ্ঠতার অপরাধে সর্বপ্রকার অবিচার অত্যাচার মাথা পাতিয়া সহ্য করিব? তবুও আজ আমরা কোন অন্যায় বা অযৌক্তিক দাবী জানাইতে চাহি না। আমরা শুধু চাই বর্ধমান ও প্রেসিডেন্সী বিভাগ জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলা এবং উত্তরবঙ্গের মালদহ দিনাজপুরের কতক অঞ্চল লইয়া জাতীয় বঙ্গের প্রতিষ্ঠা হোক...।[১৭]

এটা খুবই আশ্চর্যের ঘটনা যে, যে বাংলার হিন্দুরা একসময় তাদের সর্বশক্তি দিয়ে বাংলা ভাগ রোখার জন্য লড়েছিলেন এবং তা রুখেও ছিলেন তারাই আবার ১৯৪৬-৪৭ কালপর্বে বাংলা ভাগ করার জন্য উঠেপড়ে লাগলেন। শ্যামাপ্রসাদ দিল্লীর এক জনসভায় বললেন 'পাকিস্তান যদি গঠিত নাও হয়, মুসলিম লীগ যদি মন্ত্রী মিশন-পরিকল্পিত দুর্বল

কেন্দ্রীয় ক্ষমতা মানিয়াও লয়, তাহা হইলেও বাংলার হিন্দু মেজরিটি অঞ্চলে একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠন করিতে হইবে (২২শে এপ্রিল ১৯৪৭)[৯৮]। বঙ্গ-ভঙ্গের জন্য বাঙালী হিন্দুর এই আপ্রাণ চেষ্টা কেন — এ প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। ডঃ নজরুল ইসলাম লিখেছেন, "...১৯০৫ সালে বাংলার রাজনীতিতে শিক্ষায় ও পেশায় এগিয়ে থাকা হিন্দুদের প্রাধান্য বেশী ছিল। অখণ্ড বাংলায় তাঁদের প্রভাব-প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ থাকার প্রতিশ্রুতি ছিল। বঙ্গভঙ্গ হলে তাঁদের প্রভাব প্রতিপত্তির ক্ষেত্র সংকুচিত হয়ে পড়ছিল। কিন্তু ১৯৪৭ সালে বাংলার রাজনীতিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের প্রাধান্য স্থাপিত হয়েছে। বাংলা অবিভক্ত থাকলে সেখানে মুসলমানদের প্রাধান্যই বজায় থাকবে। হিন্দু প্রাধান্যের কোনরকম সম্ভাবনা নেই। অথচ বাংলাকে বিভক্ত করলে পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হবে। এই জন্যই হিন্দু নেতারা বঙ্গভঙ্গের দৃঢ় সমর্থক হয়ে পড়েন[৯৯]।" নজরুল ইসলামের কথায় খানিকটা সারবত্তা থাকলেও বিষয়টা তিনি অতি সরলীকরণ করেছেন। বাঙালী হিন্দুদের কাছে বাংলাভাগটা ছিল জীবনমরণের সমস্যা। কেননা ১৯৩৭ থেকে ১৯৪৭-এর দশ বছর মুসলিম শাসনের নানা ঘটনায় তারা বিপন্ন বোধ করছিল। যদিও হিন্দু মুসলমানের সম্পর্কের চূড়ান্ত অবনতি শুরু হয়েছিল তারও আগে থেকেই। ব্রুমফিল্ড ১৯১৮ সালের দাঙ্গার বিশ্লেষণে দেখিয়েছেন যে এর পেছনে ছিল পাঞ্জাবী হাবিব সা, মাদ্রাজী-কালামি ও বিহারী ফজলুর রহমান। তাঁর মতে ওটা সাধারণ দাঙ্গা ছিল না। ঐ কালপর্ব থেকেই তারা বুঝতে পারে অন্যান্য রাজনৈতিক প্রতিবাদ ব্যর্থ হলে তারা হিংসার পথে ক্রোধ ও ক্ষোভ প্রকাশ করার শক্তি ধরে। এবং হিংসার পথ নিলেই কি সরকার কি হিন্দুরা সে দিকে দৃষ্টি দিতে বাধ্য হবে। হিংসা হবে 'an effictive mode of political action." স্যার আবদুর রহিম লীগের আলিগড় অধিবেশনে বলেছিলেন যে, মুসলিম অধিকার রক্ষার জন্য সংগঠিত সংগ্রামের সময় এসেছে। তখন থেকেই তীব্র সাম্প্রদায়িক প্রচারের মাধ্যমে বুঝিয়ে দেওয়া হতে থাকল হিন্দুরা মুসলমানদের শত্রু। ১৯২৬-এর ২রা এপ্রিল কলকাতার হ্যারিসন রোডে আর্যসমাজীদের মিছিল আক্রান্ত হ'ল মুসলমানদের হাতে। ঐ মিছিলের জন্য পুলিশি অনুমতি ছিল, ছিল মিছিল রক্ষাকারী পুলিশও। শুরু হয়ে গেল দাঙ্গা। আক্রমণের হাত থেকে বাদ যায় নি মন্দির-মসজিদ গুরুদোয়ারা কোন কিছুই। দাঙ্গায় অন্তত ৫০ জনের মৃত্যু হয়। ৭০০ জন আহত হয়। লুঠ করা হয় অজস্র দোকান। এই দাঙ্গাতেই প্রথম বন্দুকের ব্যবহার দেখা গেল[১০০]। সবাই বুঝতে পারল এটা হল আবদুর রহিমের রাজনৈতিক চাল। তখন কলকাতার নিম্নবিত্ত বস্তিবাসী মুসলমানদের মধ্যে সুরাবর্দির অসীম প্রভাব। হিন্দুদের ধারণা হ'ল এই দাঙ্গার পিছনে রয়েছে সুরাবর্দির হাত। শ্বশুর মহাশয়ের রাজনৈতিক প্রতিপত্তি বাড়াতে কৌশলে তিনিই দাঙ্গা লাগিয়েছেন।

বস্তুত কৃষ্ণনগরের প্রাদেশিক কনফারেন্সে হিন্দু-মুসলিম প্যাক্ট্ প্রত্যাহারের পর থেকেই হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের চূড়ান্ত অবনতি শুরু হয়। বাংলার রাজনীতিতে মুসলিম লীগ এবং হিন্দু মহাসভার মতো দলগুলোর গুরুত্ব বাড়তে শুরু করে। তবে লীগের মতো হিন্দু মহাসভা নিজেদের কংগ্রেসের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠান হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়নি। তারা কংগ্রেসের

সহযোগিতাই করতে চেয়েছিল। হিন্দু মহাসভার নেতা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাঁর রোজনামচায় লিখেছেন "... বাংলায় কংগ্রেস আর হিন্দু সভার দুয়েরই স্থান দরকার। যতদিন হিন্দু-ধ্বংসকারী লীগ-ইংরেজ ষড়যন্ত্র চলবে ও নানা দিক থেকে হিন্দুর উপর আঘাত চলতে থাকবে, একটা হিন্দুদের জন্য রাজনৈতিক দল থাকা একান্ত প্রয়োজন। এই দল ভারতের স্বাধীনতার পরিপন্থী হবে না — সহায়তাই করবে। আর হিন্দুকে রক্ষা করতে কোন রকম পশ্চাদপদ হবে না[১০১]।"

১৯২৫ -এর পরবর্তী সময়ে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন নির্বাচনে দেখা গেল যদিও কংগ্রেস নিজেকে হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সকল ভারতবাসীর প্রতিনিধি বলে দাবী করছে তবুও ভোটে জিতছে হিন্দু ভোট পেয়ে। মুসলমান কেন্দ্রে কংগ্রেসের প্রার্থী নাই আর থাকলেও তার সাফল্যের হার কহতব্য নয়। জাতীয়তাবাদী মুসলমান লীগের বিরোধিতা করে ভোটে দাঁড়ালে কংগ্রেস সাগ্রহে সমর্থন করে। জাতীয়তাবাদী হিন্দু কংগ্রেসের হয়ে না দাঁড়ালে সেই সমর্থন পাওয়া যায় না। শ্যামাপ্রসাদ লিখছেন '... যদি কংগ্রেস লীগকে পরাজিত করে দেখাতে পারত যে বাস্তবিক মুসলমানের মধ্যে কংগ্রেসের প্রভাব আছে তাহলে অন্য কথা হত। কিন্তু মুসলমান এমনকি শিখদের কাছেও কংগ্রেস পরাজিত হ'ল। হিন্দুদের ভোট নিয়েই কংগ্রেস ব্যবস্থা পরিষদে প্রবেশ করতে পারে। অথচ হিন্দুর ন্যায্য স্বার্থরক্ষা করতে অক্ষম এবং নিজেদের হিন্দু প্রতিনিধি বলে স্বীকার করতেও রাজী নয়। ... একটা প্রতিষ্ঠান যে হিন্দুর সহায়তার উপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছে অথচ হিন্দু স্বার্থ রক্ষা করার কথা চিন্তা করা বা বলা পাপ বলে মনে করে, সেই প্রতিষ্ঠান কি করে লড়তে পারে আর এক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যে মুসলমান প্রাধান্য স্থাপন করাই, ইসলামের ধ্বজাকে বাড়িয়ে তোলাই তার একমাত্র কাম্য মনে করে[১০২]।' তবে হিন্দু স্বার্থ রক্ষায় শ্যামাপ্রসাদের এই আগ্রহাতিশয্য দেখে তাকে হেডগেওয়ার বা গোলওয়ালকরের মতো মহাসভার চরমপন্থী নেতাদের সঙ্গে একাসনে বসালে তা খুবই অবিচার হবে। শ্যামাপ্রসাদ হিন্দু মহাসভার সভাপতি নির্বাচিত হলে গান্ধিজী তাঁকে বলেন, 'প্যাটেল হচ্ছে হিন্দু মানসিকতা নিয়ে কংগ্রেসী। তুমি হও কংগ্রেস মানসিকতা নিয়ে হিন্দু[১০৩]।' ফজলুল হক শ্যামাপ্রসাদকে নিয়ে প্রগ্রেসিভ ডেমোক্রেটিক কোয়ালিশন গড়ার পর এক বিবৃতিতে বলেছিলেন 'শ্যামাপ্রসাদ মুসলিম বাংলার স্বার্থরক্ষার দায়িত্ব নিয়েছেন, আর আমি নিয়েছি হিন্দু বাংলার স্বার্থরক্ষার দায়িত্ব।' বস্তুতপক্ষে শ্যামাপ্রসাদের এই মন্ত্রীসভায় অন্তর্ভুক্তি ফজলুল হকের অনেক ঘনিষ্ঠরাও চাননি। শ্যামাপ্রসাদ সম্পর্কে আপত্তি জানানোয় ঘনিষ্ঠ সহযোগী আবুল মনসুর আহমদকে ফজলুল হক বলেছিলেন, "শুন আবুল মনসুর, তুমি শ্যামাপ্রসাদরে চিন না, আমি চিনি। সে সার আশুতোষের বেটা। করুক সে হিন্দু সভা। কিন্তু সাম্প্রদায়িক ব্যাপারে তার মত উদার ও মুসলমানের হিতকামী হিন্দু কংগ্রেসের একজনও পাবা না। আমার কথা বিশ্বাস কর। আমি সবদিক ভাইবা চিন্তাই তারে নিতেছি। আমারে যদি বিশ্বাস কর তারেও বিশ্বাস করতে হবে[১০৪]।'

আবুল মনসুরও শ্যামাপ্রসাদের সঙ্গে কিছুদিন মিশে তার মত বদলান। মনসুরের নিজের জবানিতেই শোনা যাক "... মুসলিম জনতার মনে আস্থা সৃষ্টি করার দায়িত্ব ডঃ

শ্যামাপ্রসাদের। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ ইচ্ছা করিলে তা পারেন সে বিশ্বাস আমার হইয়াছিল। প্রথমত তিনি অসাধারণ সুবক্তা ছিলেন। দ্বিতীয়ত আমি তাঁর সাথে কয়েকদিন মিশিয়াই বুঝিয়াছিলাম তাঁর সম্বন্ধে হক সাহেব যা বলিয়াছিলেন তা ঠিক। সত্য সত্যই তিনি অনেক কংগ্রেসী নেতার চেয়েও উদার। হিন্দু সভার নেতা হইয়াও কোন হিন্দু নেতার পক্ষে মুসলমানদের প্রতি এমন উদার মনোভাব পোষণ করা সম্ভব, আমার এ অভিজ্ঞতা হইল ডঃ শ্যামাপ্রসাদকে দেখিয়া।''

মুসলিম লীগ চাইছিল যেন তেন প্রকারে বাংলার রাজনীতিতে তাদের প্রভাব বিস্তার করতে। সেজন্য যতদূর যেতে হয় তা যেতে তারা রাজী ছিল। তবে শক্ত বাধা ছিল ফজলুল হক ও তার কৃষক প্রজা পার্টি। গ্রামে গঞ্জের সাধারণ মানুষদের মধ্যে তাঁর জনপ্রিয়তা প্রবল। ১৯৩৭ এর নির্বাচনের পর লীগকে ঠেকাতে ফজলুল হক কংগ্রেসের সঙ্গে কোয়ালিশন চেয়েছিলেন। কিন্তু মৌলানা আবুল কালাম আজাদের মন্ত্রণায় কংগ্রেস হাইকমান্ড সেই কোয়ালিশনে সম্মতি দেয়নি। সুভাষচন্দ্র বসু গান্ধিজীকে লেখা এক চিঠিতে অভিযোগ করেছেন যে আজাদ, নলিনী সরকার এবং বিড়লার পরামর্শেই হাইকমান্ডের এই পদক্ষেপ[১০৫]। আজাদ উত্তর প্রদেশে লীগের সঙ্গে কোয়ালিশন চাইলেও বাংলায় ফজলুল হকের কৃষক প্রজা পার্টির সঙ্গে চাননি[১০৬]। ফজলুল হক বাধ্য হলেন লীগের সঙ্গে কোয়ালিশন গড়তে। ফজলুল হকের কাঁধে ভর দিয়ে লীগ বাংলার রাজনীতিতে শক্ত ভিত গড়ে তুলল। কংগ্রেস হক কোয়ালিশন হলে নিশ্চিতভাবেই বাংলার রাজনীতি অন্য খাতে বইত।

শুধু কংগ্রেসকেই দোষ দিয়েই বা কি হবে? মহম্মদ ওয়ালিয়ুল্লা 'যুগবিচিত্রা' গ্রন্থে লিখেছেন, শেষ মুহূর্তে কি হীন উপায়ে মশারফকে ঢোকান হল। তিনি কৃষক প্রজা দলের নীতিপত্রে স্বাক্ষর করেও মুসলিম লীগ কাউন্সিলে থেকে গেলেন। হক মন্ত্রীসভার এগার জন সভ্যের নয় জন ছিলেন জমিদার শ্রেণীর এবং ছয়জন বিশেষ আসনে নির্বাচিত, একথা ভুলে শুধু কংগ্রেসকে দোষ দিলে চলবে না। কেবল সাম্প্রদায়িক আপত্তিতে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীকে নেওয়া হয়নি এ কথাও ভোলার নয়। বাঙালী হিন্দু যদি আপন সর্বনাশ ডেকে এনে থাকে, হকও খাল কেটে লীগের কুমীরকে ডেকে এনেছিলেন। সেই স্বখাত সলিলে তিনি, কৃষক প্রজা পার্টি, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, দেশের সংহতি সবই একদিন ডুবল।

বাংলার হক লীগ কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা গঠিত হবার পর পরই সরকারী মদতে বাংলার শিক্ষা সংস্কৃতির ইসালামীকরণ শুরু হয়ে যায়। অন্নদাশংকর রায়ের চোখেও ধরা পড়েছে সেই পরিবর্তন ''সাম্প্রদায়িক রোয়েদাঁদের চার বছরের ভিতরেই মুসলিম মানসে একটা ভাব বিপ্লব ঘটে যায়। হিন্দুয়ানীর কোন ধারই তারা ধারবে না। সেটা যদি হয় বাঙালীয়ানা তা হলেও না। উচ্চপদস্থ নিম্নপদস্থ সব স্তরের মুসলমানকে আমি ধুতি পরতে দেখেছিলুম। নামও অনেকের হিন্দু নাম। কিন্তু ১৯৩৭ সালের প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন যেন মুসলিম আমলের পুনরারম্ভ[১০৭]।''

শুরু হল হিন্দুদের উপর নানাবিধ অত্যাচার। ধর্মস্থানের উপর হামলা, হিন্দু নারী ধর্ষণের মতো নানা অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটতে থাকল। সরকারী চাকরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে

দেখা গেল নগ্ন সাম্প্রদায়িক আচরণ। হিন্দু সরকারী কর্মচারীদের প্রমোশন, পোস্টিং, ট্রান্সফার নিয়েও শুরু হল রাজনীতি। লাইসেন্স, কন্ট্রাক্ট থেকে বঞ্চিত হতে লাগল হিন্দুরা। হিন্দুদের ধর্মীয় উৎসবে শুরু হল হস্তক্ষেপ। সরকারী ফান্ড থেকে মুসলমান পত্রিকা গুলোকে দেদার অর্থসাহায্য দেওয়া হতে থাকল আর তারাও মনের আনন্দে খোলাখুলিভাবে সাম্প্রদায়িক প্রচার চালাতে লাগল। অন্যদিকে জাতীয়তাবাদী পত্রিকা ও হিন্দুদের সংগঠনের কাজে শুরু হল সরকারী হস্তক্ষেপ। ১৯৩৯ সালের ৩০ শে ডিসেম্বর কলকাতায় অনুষ্ঠিত হিন্দু মহাসভা সম্মেলনে এই সমস্ত ঘটনার উদাহরণ দিয়েছিলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট ও সেকেন্ডারী এডুকেশন বিল হিন্দুদের মুসলিম লীগের হাবভাব সম্পর্কে সন্দিগ্ধ করে তোলে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রী শোভিত প্রতীক নিয়ে মুসলমানদের আন্দোলন হিন্দুদের বিরক্ত করে। বন্দেমাতরম গান নিয়েও তোলা হল অহেতুক বিতর্ক। দীনেশচন্দ্র সিংহ লিখছেন 'নতুন রাজনৈতিক অধিকার লাভে আত্মহারা এবং হিন্দুদের চিরকালের জন্য শাসন ক্ষমতার অলিন্দ থেকে দূরে রাখার ব্যবস্থায় উল্লসিত মুসলিম নেতা ধর্মীয় নেতা এবং ছাত্র ও শিক্ষিত সমাজ বাংলায় ইসলামী রাজ কায়েম হয়েছে মনে করে সাহিত্যে শিল্পে সঙ্গীতে সংস্কৃতিতে সর্বত্র হিন্দুয়ানির ছায়া দেখে আঁৎকে উঠল এবং তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে মুখর হল[১০৮]।'

কিন্তু প্রতিবাদ সর্বত্র শান্তিপূর্ণ থাকল না। বলপ্রয়োগও চলল তার সাথে সাথে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামাও চলল সমানে। ১৯৩৮ সালে সারা প্রদেশে ৩১টি ছোটবড় দাঙ্গার ঘটনা ঘটে। ১৯৩৯ সালে দাঙ্গার ঘটনা ঘটে ২৩টি। এইসব ঘটনাবলী হিন্দুদের মনে এমন ধারণার সৃষ্টি করে যে মুসলিম শাসনাধীনে তারা নিরাপদ নয়। ১৯৪৬ এর দাঙ্গা এই বিশ্বাস দৃঢ়মূল করে। কলকাতায় দাঙ্গা লীগ শুরু করলেও হিন্দুরা তাদের প্রতিরোধ করে এবং প্রত্যাঘাতও করে। মুসলমানদের লাভের চেয়ে বেশী ক্ষতিই হয়। কলকাতার বদলা নিতে শুরু হয় নোয়াখালীর দাঙ্গা। সেখানে পুরুষদের হত্যা, মেয়েদের ধর্ষণ চলে নির্বিচারে। ব্যাপকভাবে করা হয় ধর্মান্তরকরণ। মেয়েদের অবস্থা হয় শোচনীয়। তাদের কারো বাবা মা কারো স্বামীকে হত্যা করা হয় শেষপর্যন্ত তাকে আবার পুনর্বিবাহ করতে হয় হত্যাকারীদেরই কাউকে। মেয়েরা ভয়ে শাঁখা সিদুর পর্যন্ত পরতে পারত না[১০৯]। নোয়াখালির প্রতিক্রিয়ায় দাঙ্গা শুরু হয় বিহারে। সেখানেও শুরু হয়ে যায় মুসলমান নিধন। মুসলমানেরাও একই ধরণের বর্বরতার শিকার হয় সেখানে। গান্ধীজীর নোয়াখালি পরিভ্রমণ সারা বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিব্রত হয় লীগ সরকার। তারা বারবার গান্ধীজীকে বিহার যেতে পরামর্শ দেয়। গান্ধীজী বললেন নোয়াখালি ও বিহার নিয়ে নিরপেক্ষ কমিশন বসুক। কিন্তু সুরাবর্দিরা বিহারে কমিশন চাইলেও নোয়াখালিতে নারাজ। এম ও কার্টার সরাসরি অভিযোগ করেছেন — খুন, ধর্ষণ অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে মামলা তুলে নেওয়ার নির্দেশ বার বার দেয় তাকে মন্ত্রীসভা। সার কথাটি বলেছেন ঐতিহাসিক অমলেশ ত্রিপাঠী '... বিহারে জোর ধাক্কা না খেলে মুসলিমদের চৈতন্য ফিরত কি না সন্দেহ'[১১০] অর্থাৎ বিহারের সংখ্যালঘু মুসলমানেরাই জামিন হয়ে বাঁচিয়েছিলেন নোয়াখালির সংখ্যালঘু হিন্দুদের।

দেশবিভাগের ক্রান্তিকালে মুর্শিদাবাদ

১৯৩৭ এ বাংলায় কৃষক প্রজা পার্টি লীগ কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা গঠনের পর থেকেই বাংলায় লীগের প্রতিপত্তি বাড়ানোর লক্ষ্যে সুপরিকল্পিত ভাবেই ইসলাম বিপন্নের জিগির তোলা হচ্ছিল। ক্ষমতা হাতে পেয়েই তারা শিক্ষা সংস্কৃতির সর্বত্র পৌত্তলিকতার ছায়া দেখতে লাগল এবং রাতারাতি তা অপসারণে কোমর বাঁধল। এর প্রতিক্রিয়ায় হিন্দুদের মধ্যে জাগল বিপন্নতার বোধ। শক্তিশালী হতে থাকল হিন্দু মহাসভা। ছেচল্লিশের দাঙ্গা হিন্দুদের বিপন্নতা বোধকে যুক্তির শক্তপোক্ত ভিতে দাঁড় করিয়ে দিল। কাজেই শুধু মুসলিম প্রাধান্যের ভয়েই হিন্দু নেতারা বঙ্গবিভাগ চেয়েছিলেন শ্রী ইসলামের এহেন বক্তব্য মেনে নেওয়া যায়না। ওই সময় অমৃতবাজার পত্রিকা জনমত যাচাই করে দেখে যে ৯৮.৩ শতাংশ হিন্দু প্রদেশ বিভাজনের পক্ষে এবং মাত্র ০.৬ শতাংশ বিপক্ষে মত দিয়েছে[১১১]। শ্রী ইসলামের বক্তব্য অনুযায়ী শুধু
উচ্চাকাঙ্খী নেতারা নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য বঙ্গবিভাগ করেছিলেন এই দাবী মানতে গেলে জনমতের এই একমুখীনতার কোন ব্যাখ্যা মেলে না। বঙ্গবিভাগ মুসলিম নেতাদের (আপামর মুসলিম জনসাধারণের কাছে নয়) কাছে ছিল দুঃস্বপ্ন কেননা সেক্ষেত্রে জনসংখ্যার বিন্যাসের কারণেই হাতছাড়া হবে কলকাতা আর হিন্দুদের (শুধু হিন্দু নেতাদের কাছে নয়) কাছে তার মানে ছিল দুঃশাসনের হাত থেকে মুক্তি, তাই তাদের কাছে তা পরম কাঙ্খিত।

১৯৪৬ সালে অবিভক্ত বাংলার শেষ বিধানসভাটি একটি ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেছিল। স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে ভারতবর্ষ দ্বিখন্ডিত হয়ে দুটি রাষ্ট্রে পরিণত হবার সাথে সাথে বাংলা প্রদেশটিও ভাগ হবে কিনা সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার ভার প্রদেশের নির্বাচিত বিধানসভার উপরই ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। মুসলিম লীগ ছিল দেশবিভাগের পক্ষে কিন্তু প্রদেশ ভাগের বিপক্ষে অন্যদিকে হিন্দু মহাসভা ছিল দেশভাগের বিপক্ষে কিন্তু প্রদেশভাগের পক্ষে। কংগ্রেস প্রথমে দেশভাগের বিপক্ষে ছিল কিন্তু যখন জিন্না তথা মুসলিম লীগের দাবী মেনে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠএলাকাগুলি নিয়ে পাকিস্থান সৃষ্টি অনিবার্য হয়ে উঠল তখন তারা একই যুক্তিতে বাংলা ও পাঞ্জাবের হিন্দু প্রধান অঞ্চলগুলির ভারতভুক্তির দাবী তোলে। প্রথমে গাঁই গুঁই করলেও জিন্নাকে শেষ পর্যন্ত কংগ্রেসের দাবী মেনে খন্ডিত এবং পোকায় কাটা পাকিস্থান নিতেই রাজী হতে হয়েছিল।

শুধু রাজনৈতিক নেতারাই যে বাংলা ভাগ চেয়েছিলেন তা কিন্তু নয়। বাংলার অগ্রগণ্য বুদ্ধিজীবীরাও বঙ্গবিভাগ চেয়েছিলেন। যদুনাথ সরকার, রমেশচন্দ্র মজুমদার, মেঘনাদ সাহা, শিশির কুমার মিত্র ও সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় ৭ই মে ভারত সচিবের কাছে এক তার বার্তা পাঠিয়ে সাম্প্রদায়িক সুরাবর্দি সরকারের প্রতি অনাস্থা জানিয়ে প্রদেশ ভাগ চেয়েছিলেন[১১২]।

১৯৪৭ -এর ৩রা জুন হিজ ম্যাজেস্টিজ গভর্ণমেন্টের বিবৃতিতে যা বলা হয়েছিল তার সারমর্ম হল এই যে, বাংলা এবং পাঞ্জাব বিধানসভার মুসলমান প্রধান জেলা ও অমুসলমান প্রধান জেলা থেকে নির্বাচিত সদস্যরা আলাদাভাবে বৈঠক করে পারস্পরিক আলোচনা বা

প্রয়োজনে ভোটাভুটি করে স্থির করবেন যে প্রদেশভাগ হবে কিনা। যদি দুটি দলের যে কোন একটি দল প্রদেশ ভাগের পক্ষে মত দেয় তবে দুটি অংশের বিধায়কদেরই আলাদাভাবে বসে স্থির করতে হবে যে তাদের অংশ প্রস্তাবিত দুটি সংবিধান সভার কোনটিতে যোগ দেবে। আর যদি দু দলের কোন দলই প্রদেশ বিভাগ না চান তবে তাদের স্থির করতে হবে যে তারা দুটি সংবিধান সভার কোনটিতে যোগ দেবেন।[১১২]

প্রদেশভাগ হবে কি না হবে এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেবার বাংলা বিধান সভার সেই অতীব গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশনটি হয় ১৯৪৭ সালের ২০ শে জুন।[১১৩] বলে নেওয়া ভালো যে কোন জেলা মুসলমান সংখ্যা গরিষ্ঠ তা স্থির হয়েছিল ১৯৪১ সালের জনগণনার ভিত্তিতে। ততদিন মুসলিম লীগের ধারণা হয়েছে যে সংখ্যার জোরে অনেক অসম্ভব চাওয়া ও পাওয়া সম্ভব হয়। ১৯৪০ এর আদমসুমারির সময় লীগের প্রচার অত্যন্ত অশ্রীল ভাষায় মুসলমানদের জনসংখ্যা বৃদ্ধি করতে উৎসাহ দিয়েছিল।[১১৪ক] ওই জনগণনা অনুযায়ী অবিভক্ত বঙ্গের ১৬টি জেলা মুসলমান প্রধান ছিল। জেলাগুলি হল চট্টগ্রাম বিভাগের চট্টগ্রাম, নোয়াখালি ও ত্রিপুরা জেলা, প্রেসিডেন্সী বিভাগের যশোর, মুর্শিদাবাদ ও নদীয়া জেলা, ঢাকা বিভাগের বাখরগঞ্জ, ঢাকা, ফরিদপুর ও ময়মনসিংহ জেলা এবং রাজশাহী বিভাগের বগুড়া, দিনাজপুর, মালদা, পাবনা, রাজশাহী এবং রংপুর জেলা। ৩রা জুনের ঘোষণায় এই জেলাগুলোর কথা আলাদা করে উল্লেখ করা হয়েছিল। প্রথমে আইনসভার যৌথ অধিবেশনে ১২৬-৯০ ভোটের ব্যবধানে স্থির হয় যে যদি প্রদেশ ভাগ না হয় তবে সে পাকিস্থানের সংবিধান সভায় যোগ দেবে। এরপর অমুসলমান প্রধান জেলার নির্বাচিত বিধায়করা ৫৮-২১ ভোটে প্রদেশ ভাগের সিদ্ধান্ত নেন এবং পশ্চিমবঙ্গের ভারতবর্ষের সংবিধান সভায় যোগদানের পক্ষে রায় দেন। অন্যদিকে মুসলমান প্রধান এলাকার নির্বাচিত বিধায়করা ১০৬-৩৫ ভোটে বঙ্গ বিভাগের বিপক্ষে সিদ্ধান্ত নেয় একই সঙ্গে তারা এও সিদ্ধান্ত নেয় যে প্রদেশ ভাগ অনিবার্য হলে মুসলমান গরিষ্ঠ অঞ্চলগুলি পাকিস্থানের সংবিধান সভায় যোগ দেবে[১১৫]।

এই একই দিনে (২০ জুন, ১৯৪৭) কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রস্তাবে মাউন্ট ব্যাটেন পরিকল্পনা যে ভারতবর্ষকে প্রকৃত স্বাধীনতা দেবে না তার উল্লেখ করা হয়েছিল। তারা বলেছিল, মাউন্ট ব্যাটেন পরিকল্পনা ভারতবর্ষকে প্রকৃত স্বাধীনতা দেয়নি। সাম্রাজ্যবাদী দুমুখো নীতি মেনে ক্ষমতা হস্তান্তর সম্পর্কে জাতীয় দাবী মেনে নেওয়ার পাশাপাশি এতে প্রকৃত স্বাধীনতা লাভে বিঘ্ন সৃষ্টিকারী নানা ধরণের বিচ্ছিন্নতাবাদী ও বিভেদকামী শক্তি সমূহকে উৎসাহিত করা হয়েছে। ব্রিটিশের 'ডিভাইড অ্যান্ড রুল' নীতির জন্য হিন্দু মুসমলানের মধ্যে যে ব্যবধান রচিত হয়েছিল তার পরিণাম হল গৃহযুদ্ধ ও দেশবিভাগ যার ফলে দুটি যুযুধান রাষ্ট্র জন্ম নিতে চলেছে...।[১১৬]

বলে রাখা ভালো সেই সময় স্বাধীন, সার্বভৌম অখন্ড বাংলার প্রস্তাবও উঠেছিল। এই প্রস্তাবের হোতা ছিলেন শরৎচন্দ্র বসু ও আবুল হাশিম। পরে কিরণ শঙ্কর রায়, সুরাবর্দি প্রমুখও এই প্রচেষ্টায় সামিল হন। সুরাবর্দির কাছে অখন্ড বাংলার প্রস্তাব খুবই লোভনীয় ছিল। কেননা লীগ মন্ত্রীসভার প্রধানমন্ত্রী হলেও তিনি জিন্নার খুব আস্থাভাজন ছিলেন না।

বঙ্গদেশ বিভাজিত হয়ে একটি অংশ পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত হলেও সুরাবর্দি নিজের রাজনৈতিক ভবিষ্যত নিয়ে বিশেষ উদ্বিগ্ন ছিলেন। কাজেই শরৎচন্দ্র বসু, আবুল হাশিম, কিরণশঙ্কর রায়েদের প্রয়াসে সুরাবর্দির ভীষণ উৎসাহ ছিল। শরৎ বসুর উডবার্ণ পার্কের বাড়ীতে এবং সুরাবর্দির থিয়েটার রোডের বাড়ীতে একাধিক বৈঠকের পর উদ্যোক্তারা স্বাধীন সার্বভৌম বাংলার একটা রূপরেখা তৈরী করেন। স্থির হয় প্রস্তাবিত স্বাধীন সার্বভৌম বাংলার প্রধানমন্ত্রী হবেন একজন মুসলমান এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হবেন হিন্দু। ১৯৪৭ সালের ২০ শে মে শরৎচন্দ্র বসুর উডবার্ণ পার্কের বাড়ীতে একটি সভায় এ সম্পর্কিত একটি চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয় — যাতে স্বাক্ষর করেছিলেন শরৎচন্দ্র বসু এবং আবুল হাশিম।[১১৭]

যদিও কংগ্রেসের একাংশ এবং মুসলিম লীগের একাংশ এই পরিকল্পনায় সামিল হয়েছিল তথাপি দল হিসাবে কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ উভয়েই এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ছিল। মুসলিম লীগের প্রাদেশিক কমিটির সভাপতি আক্রাম খান স্পষ্টতই বলেছিলেন যে, যারা বাঙালি হিন্দু ও মুসলমান এক জাতি ব'লে এবং তার ভিত্তিতে একটি স্বতন্ত্র বাংলার কথা বলছে, তারা স্পষ্টতই আমাদের শত্রুদের হাতে খেলছে। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী ও তাঁর হিন্দু মহাসভা ছিল এই প্রস্তাবের তীব্র বিরোধী। তাদের অভিমত ছিল কোনমতে অখন্ড বাংলা হাসিল করতে পারলে মুসলিম লীগ নিছক সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে হিন্দুদের দাবিয়ে রাখবে এবং পরে তাদের পাকিস্তান ভুক্তিও আটকানো যাবে না। তাই শ্যামাপ্রসাদ ভারত ভাগ হোক বা না হোক বাংলা ভাগের দাবী তুলেছিলেন। কমিউনিস্ট পার্টির প্রাদেশিক কমিটি ঘোষণা করেছিলেন, 'বঙ্গভঙ্গ চাই না, সুরাবর্দি সাহেবের বৃহত্তর বঙ্গও চাই না, কারণ উহা সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান না করে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে স্থায়ী করবে...।[১১৮]

২০ শে জুন (১৯৪৭) বাংলা বিধানসভা বঙ্গ বিভাগের প্রস্তাব গ্রহণ করার পর ৩০ শে জুনের এক নোটিফিকেশন মারফত সীমানা কমিশনের সদস্যদের নিযুক্ত করা হয়েছিল। কমিশনের দুজন হিন্দু সদস্য ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের দুজন বিচারপতি বিজন কুমার মুখার্জী এবং চারুচন্দ্র বিশ্বাস।[১১৯] কমিশনের মুসলমান সদস্যরাও ছিলেন বিচারপতি। এরা হলেন আবু সালেহ মহম্মদ আক্রম এবং এস এ রহমান। কমিশনের চেয়ারম্যান হয়েছি লেন স্যার সিরিল জন র‍্যাডক্লিফ। তখন দেশের হিন্দু মুসলমানের পারস্পরিক সম্পর্ক এত তিক্ত যে কমিশনের সদস্যরা একমত হয়ে কোন সিদ্ধান্তে পৌছবেন এমনটা ছিল দুরাশা তাই কমিশনের সদস্যরা ঐক্যমত্য না হলে যাতে চেয়ারম্যানের রায়কেই কমিশনের রায় হিসাবে গন্য করা হয় সেজন্য ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেনডেন্স বিলের প্রাসঙ্গিক ধারাটি সংশোধন করা হয়েছিল। কার্যত হয়েছিলও তাই, র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদ ছিল আসলে চেয়ারম্যান র‍্যাডক্লিফের রায়। কমিশনের ঘোষিত কাজ ছিল হিন্দু ও মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকাগুলির সীমানা নির্দেশ করা — সেই কাজ করার সময় তারা উভয় সম্প্রদায়ের বসতি কেন্দ্রের সংলগ্ন এলাকাগুলির (Contiguous areas) কথা মাথায় রাখার পাশাপাশি অন্য প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলিও (Other factors) বিবেচনা করবেন। একই সঙ্গে সিলেটের গণভোটে যদি জনমত পূর্ববঙ্গের সঙ্গে সংযুক্তির পক্ষে যায় তবে সিলেট সহ আসামের মুসলিম গরিষ্ঠ এলাকাগুলির

সীমানা নিধার্রণের দায় কমিশনের উপর বর্তিয়েছিল। সর্বোপরি এই কাজের গুরুত্বের তুলনায় কমিশনকে সময় দেওয়া হয়েছিল খুবই কম। ৭৪ দিনের মধ্যে অর্থাৎ ক্ষমতা হস্তান্তরের আগেই কমিশন তার রায় দেবে এটাই ছিল প্রত্যাশিত।

সীমানা কমিশনের প্রথম অধিবেশন বসে ১৯৪৭ সালের ৯ই জুলাই[১২০]। র‍্যাডক্লিফ একই সঙ্গে পাঞ্জাব সীমানা কমিশনের ও চেয়ারম্যান ছিলেন বলে এই অধিবেশনে হাজির ছিলেন না।[১২১] সীমানা কমিশনকে প্রভাবিত করার জন্য বিভিন্ন সংগঠনের তরফে চাপ সৃষ্টির প্রয়াস ছিল দেখবার মতো। হিন্দু মহাসভা, কংগ্রেস, মুসলিম লীগের পাশাপাশি আরো কিছু ছোটখাটো ভুঁইফোঁড় সংগঠন এই সময় সীমানা কমিশনের কাছে তাদের দাবী পেশ করে। এইসব দাবীর ক্ষেত্রে অনেক সময়েই যুক্তির কোন বালাই থাকত না। সীমানা কমিশনের কাজের সুবিধার জন্য ১৯৪১ সালের জনগণনা অনুযায়ী একটি অস্থায়ী বিভাজনও করা হয়েছিল। তবে এই অস্থায়ী বিভাজন ছিল পুরোপুরি ধর্মভিত্তিক, সীমানা কমিশনকে অন্যান্য বিষয়ও (other factors) বিবেচনায় রাখতে বলা হয়েছিল।

অস্থায়ী বিভাজনে মুর্শিদাবাদকে পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল কেননা এ জেলার জনসংখ্যার ৫৫.৫৬ শতাংশ অধিবাসীই ছিল মুসলমান। কিন্তু যেহেতু সীমানা কমিশনকে অন্যান্য বিষয়ও বিবেচনায় রাখতে বলা হয়েছিল সেইহেতু নানা প্রাসঙ্গিক যুক্তি দেখিয়ে কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভা উভয়েই মুর্শিদাবাদের ভারতভুক্তি দাবী করে। সীমানা কমিশনের কাছে মেমোরেন্ডাম পেশের জন্য মুর্শিদাবাদে কংগ্রেসের পাশাপাশি হিন্দু মহাসভার নেতারাও সামিল হয়েছিলেন। এই কমিটির সভাপতি ছিলেন রায়বাহাদুর সুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ। কমিটির যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন শ্যামাপদ ভট্টাচার্য ও সৌরীন্দ্রনাথ রায়। বিজয়কুমার গুপ্ত ও দুর্গাশঙ্কর সুকুল ছিলেন সহকারী যুগ্ম সম্পাদক। কমিটির অন্য অসদ্যদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন অম্বিকা চরণ রায়, বটকৃষ্ণ ঘোষ, রণজিৎ সিং দুধোরিয়া প্রমুখ।[১২২] এই কমিটি বাউন্ডারি কমিশনের কাছে মেমোরেন্ডাম পেশ ক'রে মুর্শিদাবাদের ভারতভুক্তির দাবী তোলে। কংগ্রেসের জেলা নেতৃত্ব তা প্রস্তাবিত বঙ্গ বিভাগের বিরুদ্ধে ও ভারতের ঐক্যের সপক্ষে কংগ্রেসের হাইকমান্ডের কাছেই মেমোরেন্ডাম পেশ করে। শুধু কংগ্রেস বা হিন্দু মহাসভাই নয় — ব্যক্তিগতভাবেও অনেকেই সীমানা কমিশনের কাছে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছেন। সংবাদসংস্থা ইউ পি আই-এর এক রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে জিয়াগঞ্জ এবং জেলার অন্য হিন্দু গরিষ্ঠ এলাকাগুলির ভারতভুক্তির জন্য সীমানা কমিশনের চেয়ারম্যানের কাছে প্রায় ১২৫টি টেলিগ্রাম পাঠানো হয়েছিল। কংগ্রেস এবং হিন্দু মহাসভার যৌথ উদ্যোগের পাশাপাশি মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুর ওয়াসিফ আলি মির্জাও মুর্শিদাবাদের ভারতভুক্তির ব্যাপারে সীমানা কমিশনের কাছে জোর সওয়াল করেছিলেন। এই কাজে নবাব বাহাদুরের দক্ষিণ হস্ত ছিলেন ডঃ নলিনাক্ষ্য সান্যাল। সীমানা কমিশনের কাছে হিন্দু মহাসভা ও কংগ্রেসের দাবি যুক্তিগ্রাহ্য ভাবে পেশ করার দায়িত্বে ছিলেন ব্যারিষ্টার এইচ এন সান্যাল এবং মৃগেন্দ্র মোহন সেন।[১২৩]

অন্যদিকে জেলার মুসলিম লীগ নেতৃত্ব মুর্শিদাবাদের পাকিস্থান ভুক্তির ব্যাপারে এতটাই আত্মপ্রত্যয়ী ছিলেন যে তারা সেভাবে মুর্শিদাবাদকে নিয়ে ভাবেইনি। মুসলিম লীগ যেন

তেন প্রকারে কলকাতা এবং হুগলী (ভাগীরথী) নদীর পূর্ব দিকের শিল্পাঞ্চল এমনকি রানাঘাট, নৈহাটি, কাঁচরাপাড়াকে পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য যেরকম সক্রিয় চেষ্টা করেছিল তার সামান্যতম অংশও বাংলা সুবার একদা রাজধানী মুর্শিদাবাদের জন্য করেনি। মুসলিম লীগের প্রাদেশিক কমিটি হামিদুল হক চৌধুরীর নেতৃত্বে বাউন্ডারী কমিশনের কাছে তাদের বক্তব্য পেশের সময় কান্দী মহকুমা ছাড়া জেলার পুরোটাই পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত করার দাবী জানিয়েছিল। মুসলিম লীগ কান্দী মহকুমার তিনটি ইউনিয়ন — গোকর্ণ, কুমারষন্ড এবং মহালন্দীকেও প্রস্তাবিত পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত করতে দাবী জানিয়েছিল[১২৪]।

মোট আটটি প্রকাশ্য অধিবেশনে বিভিন্ন সংগঠনের পরস্পর বিরোধী নানা বক্তব্য শোনার পর স্বাভাবিকভাবেই কমিশনের সদস্যদের মধ্যে কোন মতৈক্য হয়নি। এর ফলে কমিটির অমুসলমান ও মুসলমান সদস্যরা আলাদা আলাদাভাবে তাদের রিপোর্ট পেশ করে। বিচারপতি আক্রাম ও রহমানের রিপোর্টটি ২৮ শে জুলাই এবং বিচারপতি বিশ্বাস ও মুখার্জীর রিপোর্টটি ২৯ শে জুলাই কমিশনের চেয়ারম্যানের কাছে জমা পড়ে।

কংগ্রেস অখন্ড বঙ্গদেশের নদীচিত্রের উপর ভিত্তি করে সমগ্র নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ জেলার ভারতভুক্তির দাবী তুলেছিল। কলকাতা বন্দর যেহেতু এই দুটি জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত ভাগীরথী, জলঙ্গী ও মাথাভাঙা নদীর জলধারা পুষ্ট সেহেতু কলকাতা বন্দরকে বাঁচানোর স্বার্থেই জেলাদুটির ভারতভুক্তি জরুরী এই ছিল কংগ্রেসের বক্তব্য[১২৫]।

কলকাতা বন্দরকে বাঁচানোর স্বার্থে হুগলী নদীর নাব্যতা বজায় রাখার জন্য কংগ্রেসের নদীয়া মুর্শিদাবাদের উপর দাবীর যৌক্তিকতা মুসলিম লীগ তেমন জোরাল ভাবে অস্বীকার করেনি। তবে তারা কংগ্রেসের ত্রুটি ধরিয়ে দিয়ে বলেছিল যে হুগলী নদীর নাব্যতা শুধুমাত্র মাথাভাঙা, ভাগীরথী বা জলঙ্গী নদীর উপরই নির্ভরশীল নয়, হুগলী নদীর নাব্যতা দামোদর, রূপনারায়ণ প্রভৃতি নদের উপরও নির্ভরশীল সেকারণে কংগ্রেসের নদীয়া এবং মুর্শিদাবাদের উপর দাবী গ্রহণযোগ্য নয়[১২৬]।

কমিশনের অমুসলিম সদস্যেরা তাদের রিপোর্টে কংগ্রেসের দাবী এবং যুক্তি মেনে সমগ্র মুর্শিদাবাদকে ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। অমুসলিম সদস্যেরা তাদের রিপোর্টে ভারতভুক্তির জন্য যে সকল এলাকার নাম সুপারিশ করেছিলেন তাতে হিন্দু জনসংখ্যার তুলনায় যে তাদের বেশী জমি বরাদ্দ করা হয়েছিল সে বিষয়ে সচেতন ছিলেন। সে জন্য তারা ফ্লাউড কমিশনের রিপোর্ট ও এইচ এম ইশাক সংকলিত কৃষি পরিসংখ্যানের রিপোর্টের কথা উল্লেখ করে জানান যে জমির উৎপাদিকা শক্তি ও সেচ ব্যবস্থার প্রতুলতার দিক থেকে বিচার করতে গেলে পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান বিভাগের পশ্চিমাংশ বিশেষত বাঁকুড়া জেলায় মাটি প্রস্তরময় ও অনুর্বর। দক্ষিণবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকা জঙ্গলাকীর্ণ হওয়ায় বসতিহীন। কাজেই পশ্চিমবঙ্গের ভাগে কিছু জমি বেশী পড়লেও তা অন্যায্য নয়।[১২৭]

বলে রাখা ভালো হিন্দু মহাসভা মুর্শিদাবাদের ভারতভুক্তির সপক্ষে যুক্তি দেখাতে গিয়ে বাংলার প্রাচীন সেচ ব্যবস্থা সম্পর্কে স্যার উইলিয়াম উইলকক্স (Sir William Willcocks) -এর মতের উল্লেখ করেছিলেন।[১২৮] উইলকক্সের মতানুযায়ী হুগলী নদীর

পুনরুজ্জীবনের জন্য গঙ্গায় (পদ্মা) বাঁধ দেওয়া জরুরী বলে বিবেচিত হয়েছিল। এই যুক্তি খন্ডন করতে গিয়ে কমিশনের অমুসলিম সদস্যেরা বাংলার মুখ্য বাস্তুকার (Chief Engineer) -এর একটি নোটের উল্লেখ করেন যাতে বলা হয়েছিল গঙ্গা (পদ্মা) -র উপর প্রস্তাবিত ব্যারেজ এলাকায় বিপর্যয় ডেকে আনবে।[১২২]

কমিশনের মুসলিম সদস্যেরা ২৮ শে জুলাই এবং অমুসলিম সদস্যেরা ২৯ শে জুলাই তাদের রিপোর্ট চেয়ারম্যানের কাছে পেশ করে। র‍্যাডক্লিফও ১২ই আগষ্টেই তাঁর অ্যাওয়ার্ড লেখার কাজ সম্পূর্ণ করেন। কিন্তু ক্ষমতা হস্তান্তরের আগে সরকারীভাবে এই অ্যাওয়ার্ড প্রকাশ করলে তা নিয়ে ব্যাপক গন্ডগোল বেধে যেতে পারে এই আশঙ্কায় সরকার রিপোর্টটি চেপে রাখে। ভি.পি. মেননের সতর্কবার্তা মেনে মাউন্ট ব্যাটেন ক্ষমতা হস্তান্তরের পর ১৬ বা ১৭ই আগষ্ট রিপোর্টটি প্রকাশ করবেন বলে স্থির হয়। কিন্তু কোনভাবে দিল্লীতে এই রিপোর্টের অংশ বিশেষ ফাঁস হয়ে যায় এবং ১৪ই আগষ্ট কলকাতা থেকে প্রকাশিত আনন্দবাজার পত্রিকা ও হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড -এ রিপোর্ট বের হয় যে নোশনাল ডিভিসনে খুলনা জেলাকে পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করা হলেও র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদে গোটা জেলাটাই পূর্ববঙ্গকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এ নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় অল্পবিস্তর উত্তেজনাও দেখা দেয়।

কমিশনের অ্যাওয়ার্ড অনুযায়ী সমগ্র চট্টগ্রাম, ঢাকা বিভাগ, রাজসাহী বিভাগের রংপুর, বগুড়া, রাজসাহী ও পাবনা জেলা এবং প্রেসিডেন্সী বিভাগের খুলনা জেলা পূর্ববঙ্গের (পাকিস্থানের) ভাগে পড়ে। অন্যদিকে সমগ্র বর্ধমান বিভাগ, প্রেসিডেন্সী বিভাগের কলকাতা, ২৪ পরগণা ও মুর্শিদাবাদ জেলা এবং রাজশাহী বিভাগের দার্জিলিং জেলা পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। নদীয়া, যশোহর, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি ও মালদহ জেলা দুই বঙ্গের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল।

র‍্যাডক্লিফের রোয়েদাদ অনুযায়ী অখন্ড বঙ্গদেশের মোট আয়তনের শতকরা ৩৬.২০ ভাগ জমি এবং জনসংখ্যার শতকরা ৩৫.১৪ জন লোক পশ্চিমবঙ্গের ভাগে পড়ে অন্যদিকে পূর্ববঙ্গ তথা পাকিস্থঅনের জন্য বরাদ্দ হয় ৬৩.৮০ ভাগ জমি এবং শতকরা ৬৪.৮৬ জন লোক। মুসলিম জনগণের শতকরা ৮৩.৯৪ জনকে পূর্ববঙ্গে ঠাঁই দেওয়া সম্ভব হযেছিল বাকী ১৬.০৬ শতাংশ পড়েছিল পশ্চিমবঙ্গে। অন্যদিকে অমুসলিম জনসংখ্যার৫৮.২২ জনকে পশ্চিমবঙ্গে এবং ৪১.৭৮ জনকে পূর্ববঙ্গে ঠাঁই দেওয়া হয়েছিল। পূর্ববঙ্গে মুসলিম ও অমুসলিম জনসংখ্যা অনুপাত ছিল ৭০.৮৩ : ২৯.১৭ অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গে অমুসলমান ও মুসলমান জনসংখ্যার অনুপাত ছিল ৭৪.৯৯ : ২৫.০১ অর্থাৎ সীমানা কমিশনের সিদ্ধান্ত মোতাবেক পূর্ববঙ্গের মোট জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ ছিল অমুসলমান এবং পশ্চিমবঙ্গে জনসংখ্যার এক চতুর্থাংশ ছিল মুসলমান[১২৩]।

সীমানা কমিশনের কাজের সুবিধার জন্য যে অস্থায়ী বিভাজন করা হয়েছিল তাতে পশ্চিমবঙ্গের জন্য মোট ৩১,৯১৯ বর্গ মাইল এলাকা ধার্য করা হয়েছিল। কিন্তু র‍্যাডক্লিফের রোয়েদাদ অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের ভাগে বরাদ্দ করা হয়েছিল ২৮০৩৩ বর্গমাইল যা অস্থায়ী বিভাজনের চেয়ে ৩৮৮৬ বর্গমাইল কম। অনেকের ধারণা র‍্যাডক্লিফ মুসলমান প্রধান

মুর্শিদাবাদকে পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করে তার ক্ষতিপূরণ স্বরূপ হিন্দু প্রধান খুলনা জেলা পূর্ববঙ্গকে উপঢৌকন দিয়েছিলেন। কিন্তু এ মত যুক্তিগ্রাহ্য নয় কেননা খুলনার আয়তন ছিল ৪৮০৫ বর্গ মাইল। এবং মুর্শিদাবাদের আয়তন ছিল ২০৬৩ বর্গমাইল। কাজেই খুলনার সঙ্গে তার অর্ধেকেরও কম আয়তন বিশিষ্ট মুর্শিদাবাদের বিনিময়ের ব্যাখ্যা মেলেনা। সর্বোপরি ভাগীরথী সহ অন্যান্য বেশ কয়েকটি ছোট বড় নদীর অববাহিকা রক্ষার জন্য মুর্শিদাবাদের ভারতভুক্তির পক্ষে যে জোর সওয়াল করা হয়েছিল সীমানা কমিশনের অমুসলমান সদস্যদের পক্ষেও তার যৌক্তিকতা অস্বীকার করা সম্ভব হয়নি। অন্যদিকে খুলনার দক্ষিণ পূর্বদিকের দুটি থানা বাদ দিয়ে যেভাবে খুলনাকে পশ্চিবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করার দাবী তোলা হয়েছিল তাতে এই জেলাটিকে পূর্ববঙ্গে ফেলার পিছ নে বিন্দুমাত্র যুক্তি ছিল না। র‍্যাডক্লিফ আসলে এখানে Most favoured wife - এর প্রতি কিঞ্চিৎ পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছিলেন।[১০১]

স্বাধীনতা দিবসের দিন নোশনাল ডিভিশন মেনে মুর্শিদাবাদ পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে ধরে নিয়ে জেলার মুসলিম লীগ বিজয় উৎসব করে। লীগ নেতাদের উদ্যোগে বেরোয় মিছিল, তোলা হয় পাকিস্থানের পতাকা। জেলার জাতীয়তাবাদী কংগ্রেস নেতা ও হিন্দু মহাসভার কাছে সেটা ছিল শোকের দিন। পারস্পরিক অবিশ্বাসের বাতাবরণে হাওয়ায় ভাসতে থাকে গুজব। লালবাগ নতুনগ্রাম থেকে মুসলমানেরা এসে হিন্দুদের সব জমিজায়গা দখল করে নেবে এমন গুজবে বহরমপুরের হিন্দুসমাজ সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। মুসলিম লীগের প্রতিহিংসার আগুন থেকে বাঁচতে অনেক জাতীয়তাবাদী নেতার বাড়ীতেও ওড়াতে হয় পাকিস্থানের পতাকা। মুসলিম লীগ স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপনের জন্য জনসভা আহ্বান করে। জেলার হিন্দু সমাজ সেই আহ্বানে সাড়া দেয়নি। জেলার অন্যতম কমিউনিস্ট নেতা অনন্ত ভট্টাচার্য তাঁর কয়েকজন সঙ্গীসাথী নিয়ে সেই সভায় যোগ দেন।[১০২]

এরপর ১৮ই আগষ্ট র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদ অনুযায়ী মুর্শিদাবাদ ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত হয়। জেলার ম্রিয়মান হিন্দুসমাজ উৎফুল্ল হয়ে নতুন করে স্বাধীনতার উৎসবে মেতে ওঠে। গান্ধী ময়দানের এক বিশাল জনসভায় বক্তব্য রাখেন শ্রীশচন্দ্র নন্দী, কমলারঞ্জন রায় প্রমুখেরা। বলা বাহুল্য র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদ নিয়ে কংগ্রেস বা মুসলিম লীগ কেউ খুশি হয়নি। তবে যেহেতু দুপক্ষই রোয়েদাদ মেনে নেবার পূর্ব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সেহেতু দুপক্ষই রোয়েদাদ মেনে নিতে বাধ্য হয়। তবে কাজেম আলি মির্জার নেতৃত্বে জেলার মুসলিম সমাজের একাংশ জেলার এই ভারতভুক্তি মেনে নেয়নি। তারা মুর্শিদাবাদকে পুনরায় পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন। এজন্য তারা মুসলিম সমাজের অর্থবান লোকেদের কাজ থেকে অর্থসংগ্রহও করেছিলেন। কাজেম আলির লক্ষ্য ছিল এ ব্যাপারে একটি গণ আন্দোলন গড়ে তোলা এবং রাষ্ট্র সংঘের হস্তক্ষেপ চাওয়া যাতে মুসলিম গরিষ্ঠ মুর্শিদাবাদ জেলা পুনরায় পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।[১০৩] মুর্শিদাবাদের মুসলিম লীগ নেতা মহম্মদ খোদাবক্‌স (মুর্শিদাবাদে বাড়ী হলেও ইনি তখন বেলেঘাটার এম এল এ) ও নবাবজাদা কাজেম আলি মির্জা মুর্শিদাবাদের ভারতভুক্তির ব্যাপারে আপত্তি জানিয়ে জিন্নার কাছে দরবার করতে করাচি যান। জিন্না তাদের সঙ্গে দেখাই করেননি।

লিয়াকত আলি খান তাঁদের সঙ্গে দেখা করেন ও তাদের স্বান্ত্বনা দিয়ে র‍্যাডক্লিফের অ্যাওয়ার্ড মেনে নেবার পরামর্শ দেন। পরবর্তী ক্ষেত্রে কাজেম আলি মির্জা কংগ্রেসে যোগ দেওয়ায় তাঁর এই স্বপ্নের অকালমৃত্যু ঘটে[১২৪]।

তথ্য নির্দেশ ঃ

১. সেন, শীলা, মুসলিম পলিটিক্স ইন বেঙ্গল (১৯৩৭-৪৭) নিউ দিল্লী, ১৯৭৬, পৃ. ১

২. ডঃ বিষাণ কুমার গুপ্ত তাঁর 'পলিটিকাল মুভমেন্টস ইন মুর্শিদাবাদ ১৯২০-১৯৪৭' -এ বলেছেন Murshidabad is always a Muslim Majority district (পৃঃ ১৪১)। সৌমেন্দ্র কুমার গুপ্ত তাঁর 'চেনা মুর্শিদাবাদ অচেনা ইতিবৃত্ত' গ্রন্থের একটি টিকায় জানিয়েছেন যে মুর্শিদাবাদ জেলা বঙ্কিমচন্দ্রের সময়ে বা তার পরেও বহুদিন ছিল হিন্দু প্রধান, মাত্র বর্তমান শতাব্দীর (বিংশ) শুরু থেকেই এই জেলা হয়েছে মুসলিম প্রধান।' (পৃঃ ২০১) ঐতিহাসিক বিচারে দ্বিতীয় মতটিই সঠিক।

৩. গুপ্ত, বিষাণ কুমার, পলিটিকাল মুভমেন্টস ইন মুর্শিদাবাদ ১৯২০-১৯৪৭, কলকাতা ১৯৯২ পৃঃ ১৪৪.

৪. গুপ্ত বিষাণ কুমার, মুর্শিদাবাদ জেলার সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী মানসিকতা বনাম সাম্প্রদায়িক রাজনীতি, ১৯২০-১৯৪৭, বার্ষিক মুর্শিদাবাদ বীক্ষণ ১৯৯৩
৫. গুপ্ত, বিষাণ কুমার, পলিটিকাল মুভমেন্টস ইন মুর্শিদাবাদ ১৯২০-১৯৪৭, পৃঃ ১৪৭
৬. দাস বিশ্বাস, প্রকাশ, মুর্শিদাবাদের মনীষী, বহরমপুর, ২০০১ পৃঃ ৪২
৭. গুপ্ত, বিষাণ কুমার, পলিটিকাল মুভমেন্টস ইন মুর্শিদাবাদ ১৯২০-১৯৪৭, পৃঃ ১৪৭
৮. গুপ্ত, বিষাণ কুমার, পূর্বোক্ত পৃঃ ৫১
৯. চট্টোপাধ্যায়, ভবানীপ্রসাদ, দেশবিভাগ পশ্চাৎ ও নেপথ্য কাহিনী, কলকাতা, ১৯৯৩, পৃঃ ২২.
১০. চট্টোপাধ্যায়, ভবানীপ্রসাদ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩০
১১. সেন, শীলা, পূর্বোক্ত পৃঃ ৬৮-৬৯
১২. রহিম. এম. এ. বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস
১৩. ইসলাম, নজরুল, বাংলায় হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক, পৃঃ ২৪৪
১৪. ইসলাম, নজরুল, পূর্বোক্ত পৃঃ ২৪৫
১৫. গুপ্ত, বিষাণ কুমার, মুর্শিদাবাদ জেলার সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী মানসিকতা বনাম সাম্প্রদায়িক রাজনীতি, ১৯২০-১৯৪৭, বার্ষিক মুর্শিদাবাদ বীক্ষণ ১৯৯৩
১৬. ঘোষ, বিশ্বরূপ, বিভাগপূর্ব বাংলার রাজনীতি এবং মুসলিম লীগ জাতীয় রক্ষীবাহিনী, ১৯৩৭-১৯৪৭, ইতিহাস অনুসন্ধান - ১৪, পৃঃ ২৮৭-২৯২
১৭. ঘোষ, বিশ্বরূপ, পূর্বোক্ত পৃঃ ২৮৭
১৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলেশকুমার, দাঙ্গার ইতিহাস, কলকাতা, পৃঃ ৪৯
১৯. গুপ্ত, বিষাণ কুমার, পলিটিকাল মুভমেন্ট্স ইন মুর্শিদাবাদ ১৯২০-১৯৪৭,পৃঃ ১৫৬
২০. গুপ্ত, প্রফুল্ল কুমার, স্বাধীনতা সংগ্রামে মুর্শিদাবাদ, কলকাতা, ১৯৭৫, পৃঃ ৯৮
২১. সেনগুপ্ত, সুখরঞ্জন, বঙ্গসংহার এবং..., কলকাতা, ২002, পৃঃ ৩২
২২. আহমদ, আবুল মনসুর, আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃঃ ১১৩-১১৫
২৩. বিশ্বাস, কালীপদ, যুক্ত বাংলার শেষ অধ্যায়, কলকাতা, ১৯৬০, পৃঃ ৩২
২৪. দে, জে এন, দি হিস্ট্রি অ্যান্ড দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য কৃষক প্রজা পার্টি, পি এইচ ডি থিসিস, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৭৭
২৫. ইসলাম, নজরুল, পূর্বোক্ত পৃঃ ২৪৭
২৬. সরকার, কমলা, বেঙ্গল পলিটিক্স (১৯৩৭-১৯৪৭), কলকাতা, ১৯৯০, পৃঃ ৬৭
২৭. সরকার, কমলা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬৫; সেন, শীলা পূর্বোক্ত, পৃঃ ৯৩-১০০
২৮. সরকার, কমলা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬৮
২৯. সরকার, কমলা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬৮
৩০. সরকার, কমলা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭১
৩১. সরকার, কমলা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬৩
৩২. সরকার, কমলা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭২
৩৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্দীপ, ইতিহাসের দিকে ফিরে ঃ ছেচল্লিশের দাঙ্গা, কলকাতা ১৯৯৩, পৃঃ ১৩
৩৪. ত্রিপাঠী, অমলেশ, স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস (১৮৮৫-১৯৪৭) কলকাতা

পৃঃ ২৫৭
৩৫. চট্টোপাধ্যায়, ভবনীপ্রসাদ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৬
৩৬. ইসলাম, নজরুল, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৪৮
৩৭. সরকার, কমলা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭৫
৩৮. গুপ্ত, বিষাণ কুমার, পলিটিকাল মুভমেন্টস ইন মুর্শিদাবাদ ১৯২০-১৯৪৭, পৃঃ ৯১
৩৯. রাহা, সনৎ, কমিউনিষ্ট আন্দোলনে মুর্শিদাবাদ (১৯৩৮-৬৪) প্রথম খন্ড, পৃঃ ৩
৪০. হাশিম, আবুল, আমার জীবন ও বিভাগপূর্ব বাংলাদেশের রাজনীতি, কলকাতা, ১৯৮৮, পৃঃ ১৪৬
৪১. আজাদ, আবুল কালাম, ভারত স্বাধীন হল, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃঃ ২২৭
৪২. চট্টোপাধ্যায়, ভবানীপ্রসাদ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৩
৪৩. গুপ্ত, প্রফুল্লকুমার, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১০০
৪৪. চট্টোপাধ্যায়, ভবানীপ্রসাদ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৩-৪৪
৪৫. ত্রিপাঠী, অমলেশ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৩৮
৪৬. সরকার,কমলা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮০
৪৭. ত্রিপাঠী, অমলেশ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৩৯
৪৮. গুপ্ত, বিষাণ কুমার, পলিটিকাল মুভমেন্টস ইন মুর্শিদাবাদ ১৯২০-১৯৪৭, পৃঃ ৪৬-৪৭
৪৯. ত্রিপাঠী, অমলেশ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৩৯
৫০. সরকার, কমলা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮৩
৫১. ত্রিপাঠী, অমলেশ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৪১
৫২. জায়দি (সম্পাদিত) এম. এ. জিন্না — ইস্পাহানি করেসপণ্ডেন্স, করাচি, ১৯৭৭, উদ্ধৃত ত্রিপাঠী, অমলেশ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৪২
৫৩. সরকার, কমলা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮৩-৮৪
৫৪. সরকার, কমলা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১৫
৫৫. সরকার, কমলা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮৮
৫৬. চট্টোপাধ্যায়, ভবানীপ্রসাদ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৫
৫৭. চট্টোপাধ্যায়, ভবানীপ্রসাদ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৭
৫৮. চট্টোপাধ্যায়, ভবানীপ্রসাদ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫৭
৫৯. রায়চৌধুরী, লাডলীমোহন, ক্ষমতা হস্তান্তর ও দেশ বিভাগ, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃঃ ৫৮
৬০. আজাদ, আবুল কালাম, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৮৫
৬১. রায়চৌধুরী, লাডলীমোহন, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬০
৬২. গুপ্ত, বিষাণ কুমার, পলিটিকাল মুভমেন্টস ইন মুর্শিদাবাদ ১৯২০-১৯৪৭, পৃঃ ১৫৫-১৫৬
৬৩. ত্রিপাঠী, অমলেশ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৯৮
৬৪. ত্রিপাঠী, অমলেশ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৩৮
৬৫. ত্রিপাঠী, অমলেশ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৯৯
৬৬. সরকার, কমলা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৯৩
৬৭. রায়চৌধুরী, লাডলীমোহন, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৬
৬৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্দীপ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৭
৬৯. রায়চৌধুরী, লাডলীমোহন, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৭

৭০. আজাদ, আবুল কালাম, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৫১
৭১. ত্রিপাঠী, অমলেশ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৩৩
৭২. ঘোষ, শংকর, হস্তান্তর, স্বাধীনতার অর্ধশতক, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃঃ ৯৯
৭৩. এন মানসারগ (সম্পাদিত) দি ট্রান্সফার অফ পাওয়ার, অষ্টম খন্ড পৃঃ ২৪০, ২৯৫-৯৬, উদ্ধৃত করেছেন সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৮
৭৪. হাশিম, আবুল, ইন রেট্রোস্পেকশান, পৃঃ ১১৬
৭৫. অমৃত বাজার পত্রিকা, ৩১ শে জুলাই ১৯৪৬, উদ্ধৃত করেছেন সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ২৫
৭৬. বন্দোপাধ্যায়, সন্দীপ, পূর্বোক্ত পৃঃ ২৭-২৮
৭৭. মুখ্যোপাধ্যায়, উমাপ্রসাদ (সম্পাদিত), শ্যামাপ্রসাদের ডায়েরী ও মৃত্যু প্রসঙ্গ, কলকাতা ১৯৮৮, পৃঃ ৫৮
৭৮. দাস, সুরঞ্জন, কমিউনাল রায়টস ইন বেঙ্গল, পৃঃ ১৭৭-৭৯, উদ্ধৃত করেছেন সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ৪৫
৭৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্দীপ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৫-৪৬
৮০. রায়, অন্নদাশংকর, যুক্তবঙ্গের স্মৃতি, কলকাতা, ১৯৯০, পৃঃ ১০০
৮১. সেন, মণিকুন্তলা, সেদিনের কথা, কলকাতা, ১৯৮২, পৃঃ ১৭৯
৮২. প্রবাসী, আশ্বিন ১৩৫৩, উদ্ধৃত করেছেন সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ৪৫
৮৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্দীপ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৬
৪৪. রায় অন্নদাশংকর, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১০০
৮৫. রহিম, এম. এ. পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৮০-৮২
৮৬. অমৃতবাজার পত্রিকা, ১৬ ই অকটোবর ১৯৪৬, সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় উদ্ধৃত করেছেন তাঁর বইয়ে পৃঃ ৬৩
৮৭. সিংহ, দীনেশ চন্দ্র, নোয়াখালির মাটি ও মানুষ, পৃঃ ১২৮
৮৮. হাসনাত, আবুল, সাধক ওগো প্রেমিক ওগো; বহরমপুর, ১৯৯৪ পৃঃ ১৬
৮৯. ঘোষ, শংকর, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১০৮
৯০. ঘোষ, শংকর, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১০৮
৯১. রায়চৌধুরী, লাডলীমোহন, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৯
৯২. রায়চৌধুরী, লাডলীমোহন, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৫
৯৩. রায়চৌধুরী, লাডলীমোহন, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৬
৯৪. রায়চৌধুরী, লাডলীমোহন, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৯
৯৫. ত্রিপাঠী অমলেশ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৮২
৯৬. রায়চৌধুরী লাডলীমোহন, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৬-৩৭
৯৭. আনন্দবাজার পত্রিকা, ৬ ই জুন, ১৯৪৭, উদ্ধৃত করেছেন লাডলীমোহন রায়চৌধুরী পৃঃ ৯৯
৯৮. সিংহ, দীনেশচন্দ্র, শ্যামাপ্রসাদ, বঙ্গবিভাগ ও পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা, ২০০০, পৃঃ ২৭৫
৯৯. ইসলাম, নজরুল, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৬৪
১০০. ত্রিপাঠী, অমলেশ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৩৯
১০১. মুখ্যোপাধ্যায়, উমাপ্রসাদ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৬
১০২. মুখ্যোপাধ্যায়, উমাপ্রসাদ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫৮
১০৩. দাস, সন্দীপ, এক মহাজীবনের নাম, দেশ, ৪ জুলাই, ২০০১

১০৪. রায়, তথাগত রাজনীতিক শ্যামাপ্রসাদের মূল্যায়ণ আজও হয়নি দেশ ৪ জুলাই, ২০০১

১০৫. দাস, শ্যামলেশ, দূরদর্শী রাজনীতিক শ্যামাপ্রসাদ, কলকাতা, ১৯৯৭, পৃঃ ৬২

১০৬. আজাদ, আবুল কালাম, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৫৬

১০৭. রায়, অন্নদাশংকর, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৪

১০৮. সিংহ, দীনেশচন্দ্র, শ্যামাপ্রসাদ ঃ বঙ্গবিভাগ ও পশ্চিমবঙ্গ, পৃঃ ৪৩

১০৯. ১৯৪৬ সালের ২৬শে অক্টোবর এক সাংবাদিক সম্মেলনে আচার্য কৃপালনী নোয়াখালির ঘটনা সমূহের তথ্যনিষ্ঠ বিবরণ দেন। অশোকা গুপ্তের 'নোয়াখালির দূর্যোগের দিনে' ও শ্রী সিংহের পূর্বোল্লিখিত বইদুটিতে নোয়াখালির দাঙ্গার বিস্তৃত বিবরণ রয়েছে।

১১০. ত্রিপাঠী, অমলেশ, পৃঃ ৪৫২

১১১. সেন, শীলা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২২৭

১১২. ত্রিপাঠী, অমলেশ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৬৮

১১৩. রায়চৌধুরী, লাডলীমোহন, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮৮

১১৪. রায়চৌধুরী, লাডলীমোহন, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮৯

১১৪ক. সেনগুপ্ত, অমলেন্দু, উত্তাল চল্লিশ ঃ অসমাপ্ত বিপ্লব, পৃঃ ২০৮

১১৫. রায়চৌধুরী লাডলীমোহন, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮৯

১১৬. রায়চৌধুরী, লাডলীমোহন, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭৩

১১৭. ঘোষ, শংকর, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৭১

১১৮. ঘোষ, শংকর, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৬৭

১১৯. রায়চৌধুরী, লাডলীমোহন, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৯৬

১২০. রায়চৌধুরী, লাডলীমোহন, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৯৭

১২১. ঘোষ, শংকর, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৫৪

১২২. গুপ্ত, বিষাণ কুমার, পলিটিকাল মুভমেন্টস ইন মুর্শিদাবাদ ১৯২০-১৯৪৭, পৃঃ ১৬৪

১২৩. গুপ্ত, বিষাণ কুমার, পলিটিকাল মুভমেন্টস ইন মুর্শিদাবাদ ১৯২০-১৯৪৭, পৃঃ ১৬৫

১২৪. হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড, কলকাতা ২৬.৭.৪৭, উদ্ধৃত করেছেন ডঃ বিষাণ কুমার গুপ্ত, পৃঃ ১৫৯

১২৫. রায়চৌধুরী, লাডলীমোহন, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১০৩

১২৬. রায়চৌধুরী, লাডলীমোহন, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১০৩

১২৭. রায়চৌধুরী, লাডলীমোহন, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১০৮

১২৮. চক্রবর্তী, মনমোহন, এ. সামারি অফ দ্য চেঞ্জেস ইন দি জুরিসডিকশন অফ ডিস্ট্রিক্টস অফ বেঙ্গল ১৭৫৭-১৯১৬, পৃঃ ১৮৯

১২৯. চক্রবর্তী, মনমোহন, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২০৬

১৩০. রায়চৌধুরী, লাডলীমোহন, পৃঃ ১১২

১৩১. ব্রিটিশ শাসকেরা বরাবরই মুসলিম লীগকে তোষণ করেছে। তাদের বেশী গুরুত্ব দিয়েছে। চার্চিল মাউন্ট ব্যাটেনকে বলেছিলেন, 'আমি তোমাকে একটি কথা বলে দিতে চাই। .... যে কোন ব্যবস্থাই তুমি কর না কেন তুমি অবশ্যই দেখো যেন কোন মুসলমানের একটি চুলেরও ক্ষতি না হয়।' পিলগ্রিমেজ টু ফ্রিডম, পার্ট - ১, কে এম মুন্সী, উদ্ধৃত করেছেন ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, পৃঃ ৪৯

১৩২. ঝা, শক্তিনাথ, দেশ ও কালের প্রেক্ষিতে অনন্ত ভট্টাচার্য, মুর্শিদাবাদ জেলার রাজনৈতিক আন্দোলনের ধারা ১৯২৫-১৯৭৫, বিপ্লবী অনন্ত ভট্টাচার্য স্মারক গ্রন্থ, বহরমপুর, ১৯৯৩, পৃঃ ৪৫

১৩৩. গুপ্ত, বিষাণ কুমার, মুর্শিদাবাদ জেলার কয়েকজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ১৯০০-১৯৪৭, গণকণ্ঠ বিশেষ সংখ্যা ১৯৯০

১৩৪. সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত আরেকটি মজার ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন। ১৯৫৭ সালে কাজেম আলি মির্জা বিধান রায়ের মন্ত্রীসভায় রাষ্ট্রমন্ত্রী হয়েছিলেন। সেই বছর কোন এক সময়ে বিধানসভার 'কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ' এই মর্মে তিনি একটি বেসরকারী প্রস্তাব উত্থাপন করেন। প্রস্তাব গৃহীত হবার পরে কাজেম আলি এম এল এদের কাছে গিয়ে সই করিয়ে নেন। কিন্তু বিধান সভার নির্দল সদস্য সৈয়দ বদরুদ্দোজাই একমাত্র সই করতে রাজি হলেন না। তখন কাজেম আলি বদরুদ্দোজা সাহেবকে ব্যঙ্গ করে কিছু কথা বলেছিলেন। বদরুদ্দোজা সাহেব রেগে গিয়ে চেঁচিয়ে তার উত্তরে বলেন — কাজেম আলি আমাকে ঘাঁটিও না, র‍্যাডক্লিফ যখন মুর্শিদাবাদ ইন্ডিয়াকে দিলেন তখন তুমি এখান থেকে ছুটে করাচি যাওনি? লিয়াকত সাহেবের কাছে গিয়ে কান্নাকাটি করোনি? এখন আমাকে দেশপ্রেম শেখাচ্ছ। আমার আনুগত্য ভারতীয় সংবিধানের প্রতি। অতুল্য ঘোষের কোন অপসৃষ্টির প্রতি নয়। (বঙ্গসংহার এবং..., পৃঃ ৬৮)

(২)

দেশ বিভাগ যে নিছকই একটি আকস্মিক ঘটনা ছিল না এটা যেমন সত্যি কথা তেমনি ১৯৪৭ -এর ১৫ই আগষ্টই যে সেই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে গেছিল ব্যাপারটা এমনও ছিল না। দেশবিভাগ ছিল অনেকগুলো কার্যকারণের ফলে উদ্ভুত পরিস্থিতির অনিবার্য ফলশ্রুতি। আর সেই বিভাগের ফল হয়েছিল সুদূরপ্রসারী। আজো ভুক্তভোগী মানুষ তা সমানে ভোগ করে চলেছেন। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের কথা এখানে অপ্রাসঙ্গিক। প্রাসঙ্গিক শুধু বাংলা আর পাঞ্জাবের কথা। দেশবিভাগের প্রত্যক্ষ অভিঘাত লেগেছিল এই দুটো প্রদেশেই। দুটো প্রদেশই কলমের এক আঁচড়ে ভাগাভাগি হয়ে গিয়েছিল দুটো পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্রে — জন্মলগ্ন থেকেই যাদের সম্পর্ক অহি-নকুলের। তুমুল রক্তপাত, অনেক কান্নার মধ্য দিয়ে পাঞ্জাব দ্রুত থিতু হতে পেরেছিল কেননা সেখানে সরকারী ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায়, প্রায় সম্পূর্ণ লোক বিনিময় করা গেছিল। বাংলার ক্ষেত্রে তেমনটা হয়নি। পূর্ববঙ্গ থেকে অজস্র হিন্দু উদ্বাস্তু পশ্চিমবঙ্গে এলেও পশ্চিমবঙ্গ থেকে খুব কম সংখ্যক মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ পাড়ি জমিয়েছিল পূর্ববঙ্গে। প্রাক স্বাধীনতা যুগে যারা মুসলীম লীগ রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন তারা পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে অজানা আশঙ্কায় দেশত্যাগ করেছিলেন। আর দেশত্যাগ করেছিলেন কিছু স্বচ্ছল বিত্তবান মুসলমান। তবে একথা অনস্বীকার্য দেশত্যাগীদের মধ্যে ছিলেন মুসলিম সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরাই। কি রাজনৈতিক ক্ষেত্র বা কি বৌদ্ধিক ক্ষেত্র সকল ক্ষেত্রেই প্রাগ্রসর মুসলমানদের দেশত্যাগ সাধারণ মুসলমানদের সঙ্কটে ফেলে দেয়। সারা পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে এটা যতটা না সত্যি তার চেয়ে ঢের বেশী সত্যি মুর্শিদাবাদের ক্ষেত্রে। কেননা অবিভক্ত বঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলাটি ছিল মুসলমান প্রধান এবং খুব সঙ্গত কারণেই সারা দেশের মুসলমানদের সঙ্গে মুর্শিদাবাদ জেলার মুসলমানদেরও দৃঢ় বিশ্বাস ছিল দেশবিভাগ হলে মুর্শিদাবাদ জেলা নিশ্চিত ভাবেই পাকিস্থানের ভাগে পড়বে। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতার পূন্যমুহূর্তে মুর্শিদাবাদ পাকিস্থানে পড়েছে ধরে নিয়েই জেলার মুসলমানেরা আনন্দে মেতে ওঠে। নানা জায়গায় পালিত হয় বিজয়োৎসব। কিন্তু সেই আনন্দের রেশ কাটতে বেশী সময় লাগেনি। র‍্যাডক্লিফের রোয়েদাদ সম্পূর্ণ প্রকাশিত হলে দেখা যায় যে অপ্রত্যাশিতভাবে মুসলমান প্রধান মুর্শিদাবাদ জেলাকে রাখা হয়েছে ভারতবর্ষের মধ্যে আর হিন্দু প্রধান খুলনাকে দেওয়া হয়েছে পাকিস্থানে। এই আকস্মিক পটপরিবর্তনে জেলার ম্রিয়মান হিন্দু সমাজ উৎফুল্ল হয়ে আনন্দে মেতে ওঠে আর মুসলমান সমাজ হতাশায় ভেঙে পড়ে। সম্ভাব্য হেনস্থার আশঙ্কায় মুসলিম লীগের স্থানীয় নেতৃবৃন্দ এবং মুসলমান সমাজ থেকে উত্থিত বুদ্ধিজীবী সমাজ দেশত্যাগ করেন। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ লিখেছেন — "মুসলিম লীগপন্থীদের বোঝানো হয়েছিল, একবার পাকিস্থান হলে, সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশেরই হোক আর সংখ্যালঘু প্রদেশেরই হোক, মুসলমানেরা পৃথক জাতি বলে গণ্য হবে এবং নিজেদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের অধিকার পাবে। যখন

মুসলিম প্রধান প্রদেশগুলো ভারত থেকে বেরিয়ে গেল এবং এমন কি বাংলা আর পাঞ্জাবও ভেঙে দুটুকরো হল আর মিঃ জিন্না করাচি পাড়ি দিলেন, উজবুকের, দল বুঝতে পারল যে, ভারত বিভাগের ফলে তাদের লাভ তো কানাকড়িও হয় নি — বরং তারা সর্বস্ব হারিয়েছে। জিন্নার অন্তিম বাণী তাদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে দিল। এতদিনে তাদের কাজে স্পষ্ট হ'ল দেশভাগের একমাত্র ফল হয়েছে এই যে, সংখ্যালঘু হিসেবে তারা আরও হীনবল হয়ে পড়েছে। উপরন্তু, বেকুবের মতো কাজ করে হিন্দুদের তারা ক্ষেপিয়ে দিয়েছে আর তিক্ত বিরক্ত করেছে^৬।'' জেলার মুসলমান সমাজের আলোকিত অংশের দেশত্যাগে সাধারণ মুসলমানদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে। বিত্তবান মুসলমানেরা তো বটেই মধ্যবিত্ত এবং শিক্ষিত মুসলমানদের একাংশের এই দেশত্যাগে জেলার মুসলমান সমাজ নেতৃত্বহীন হয়ে পড়ে। অনেক মধ্যবিত্ত পরিবার একেবারে দেশ না ছাড়লেও পরিবারের সবচেয়ে সম্ভবনাময় সন্তানটিকে পূর্ববঙ্গে পাঠিয়ে দেয় যাতে সে সেখানে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে — অথচ এপার বাংলার সঙ্গেও যোগাযোগ বজায় থাকে। মধ্যবিত্ত মুসলমানদের দেশত্যাগের পিছনে আরেকটা বড় কারণ ছিল জমির লোভ। পূর্ববঙ্গের বিত্তশালী হিন্দুরা দেশ ছেড়ে আসার সময় যে বিপুল জমিজমা ফেলে আসছিলেন এপারে সামান্য জমির বিনিময়ে ওপারে সেই বিপুল সম্পত্তির মালিক হবার লোভ দমন করা বেশ কঠিন ছিল। ফলে অধিক সম্পত্তি লাভের আশায় বেশ কিছু মধ্যবিত্ত মুসলিম পরিবার পূর্ববঙ্গে পাড়ী জমায়। তবে একথা অনস্বীকার্য যে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তু স্রোতের সঙ্গে পূর্ববঙ্গমুখী উদ্বাস্তুদের সংখ্যার কোন তুলনাই হয় না। সে যাই হোক জেলার মুসলমান সমাজের প্রাগ্রসর অংশের এই রকম দেশত্যাগে সাধারণ মুসলমানেরা আতান্তরে পড়ে। একদিকে যেমন যোগ্য নেতৃত্বের অভাব অন্যদিকে তেমনি নিরাপত্তাহীনতার বোধ। এই দুইয়ে মিলে জেলার মুসলমান সমাজকে কিংকর্তব্য বিমূঢ় করে ফেলে। তবে জেলার মুসলমানদের জোর ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠতায়। এর উপর ছিলেন মুসলমান সমাজের জাতীয়তাবাদী নেতারা। রেজাউল করীম -এর মতো জাতীয়তাবাদী নেতারা, দেশ বিভাগের আগে সাধারণ মুসলমানদের উপর যাদের প্রভাব ছিল অকিঞ্চিৎকর, দেশবিভাগের পর তাঁরাই হয়ে দাঁড়ালেন মুসলমানদের আশা ভরসার কেন্দ্র। সারা জেলা ঘুরে রেজাউল করীম আশ্বাস দিলেন সাধারণ মুসলমানদের — অযথা আশঙ্কায় ভীত হয়ে দেশত্যাগ করার দরকার নেই। কংগ্রেস সাধারণ মুসলমানদের পাশে আছে। সৈয়দ বদরুদ্দোজাও একইভাবে দেশত্যাগের বিরুদ্ধে প্রচারে নামলেন। তাদের এই প্রচার সাধারণ মুসলমানদের যে কিছুটা আশ্বস্ত করতে পেরেছিল তা নিয়ে খুব বেশী দ্বিমতের জায়গা নেই।

তবে জেলার সাধারণ মুসলমানের সমস্যাটা ছিল মূলত মানসিক। লড়কে লেঙ্গে পাকিস্থান স্লোগান দিয়ে পাকিস্থান হাসিল করার পরেও তারা হিন্দু ভারতের নাগরিক থেকে গেল স্বপ্নভঙ্গের এই বেদনা তাদের কুরে কুরে খাচ্ছিল। ''দেশবিভাগের পর মুসলমানদের জীবন সাধারণভাবে দিন যাপনের গ্লানিতেই আচ্ছন্ন ছিল। দেশ গঠনের ক্ষেত্রে তারাও যে একটি বিশিষ্ট উপাদান সেটি তারা ভাবতে পারছিল না। কেননা পাকিস্থান সৃষ্টির জন্য

তাদেরই দায়ী করা হচ্ছিল। বিভাগোত্তর এই দেশের মুসলমানদের জীবনের মস্ত বড় ট্রাজেডী ছিল তাদের কেউ বিশ্বাস করছিল না। 'পাকিস্থানি দালাল' এই ছিল সাধারণ পরিচয়। ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের ওপর ভিত্তি করে ভারতবর্ষ বিভক্ত হয়েছিল। ফলত দেশ ব্যবচ্ছেদের অব্যবহিত পরে এতদ্দেশীয় মুসলমানদের প্রধান সমস্যা ছিল মানসিক স্থিতির সমস্যা[৭]।"

এই মানসিক স্থিতির সমস্যা দূর হতে পারত যোগ্য নেতৃত্বের সুযোগ্য পরিচালনায়। কিন্তু সেখানটাও খুব সুদৃঢ় ছিল না। বৌদ্ধিক নেতৃত্বদানে সক্ষম আবার সাধারণ মুসলমানদের তার প্রতি আস্থা আছে এমন নেতার অভাবে জেলার মুসলমান সমাজ কার্যত দিশাহারা হয়ে পড়ে। এর উপর ছিল পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তু হিন্দুদের সঙ্গে ছোটখাটো স্বার্থসংশ্লিষ্ট সংঘাত। সাতপুরুষের ভিটেমাটি, পৈতৃক জমিজিরেত ছেড়ে পালিয়ে আসা, চোখের সামনে পরিবারের মহিলাদের সম্ভ্রমহানি ঘটতে দেখা সেই অসহিষ্ণু উদ্বাস্তুদের অসহায় রাগের লক্ষ্য ছিলেন সাধারণ মুসলমান সমাজ। উদ্বাস্তুদের ছিল এদেশে নতুন করে থিতু হবার সমস্যা। সব মিলিয়ে সম্পর্কটা খুব সহজ ছিল না। ছোট খাটো দাঙ্গা হাঙ্গামা লেগেই থাকত। দেশ বিভাগ পরবর্তীকালে জেলা তথা-সমগ্র রাজ্যের হিন্দু মহাসভার নেতা ও কর্মীরা কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিল কিন্তু কংগ্রেসে যোগ দিলেও তাদের ধর্মাশ্রয়ী সাম্প্রদায়িকতাবাদী মনোভাব যে রাতারাতি পরিবর্তিত হয়ে গেছিল তা নয়। অন্যদিকে সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে যেভাবে একান্তভাবেই মুসলমানদের জন্য পাকিস্থান হাসিল করার বলা হয়েছিল তাতে তাদের প্রত্যাশার পারদ বেড়ে গেছিল। মূলত দরিদ্র চাষী ও ক্ষেতমজুর পেশার মুসলমানদের কাছে তা ছিল হিন্দু ভূস্বামী জোতদারদের অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচার উপায়। আকাশচুম্বী এই প্রত্যাশা থেকে স্বপ্নভঙ্গের বেদনা মুর্শিদাবাদের মুসলমান সমাজকে বিহ্বল করে। এর সঙ্গে যোগ হয় নেতৃত্বের শূন্যতা। সব মিলিয়ে পরিস্থিতিটা মোটেও অনুকুল ছিল না।

দুশো বছরের পরাধীনতার পর একটা সদ্য স্বাধীন দেশের নাগরিকদের যা করা উচিত তা হ'ল নতুন ক'রে দেশ গঠনে কোমর বেঁধে লাগা। ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার খারাপ দিকগুলোকে বর্জন করে শাসনব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো। দেশের নাগরিকদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহনেই এই কাজটা সুষ্ঠভাবে হতে পারত। কিন্তু আদতে তা হয়নি। ছেচল্লিশের দাঙ্গা, বিহার আর নোয়াখালির দুঃখজনক ঘটনাসমূহ দেশের নাগরিকদের দুটি যুযুধান শিবিরে ঠেলে দিয়েছিল। পারস্পরিক সহযোগিতা দূরে থাক অবিশ্বাসের বাতাবরণ দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে ভাবের স্বাভাবিক আদানপ্রদান থেকেও বিরত রাখে। দেশবিভাগের ফলে সাম্প্রদায়িক সমস্যা চিরতরে মিটে যাবে বলে যারা আশা করেছিলেন তাদের আশা ভ্রান্ত বলে অচিরেই প্রমাণ হয়। এমত পরিস্থিতিতে উদ্ভুত সাম্প্রদায়িক সমস্যা সামাল দিতে জেলার বিভিন্ন প্রান্তে শান্তিসেনা বাহিনী গঠিত হয়। মূলত বামপন্থীদের নেতৃত্বে জেলার বিভিন্ন প্রান্তে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার উদ্দেশ্যে মিছিল সংগঠিত করা হয়। ১৯৪৭ সালের ২২শে নভেম্বর বহরমপুরে জেলা শান্তি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। 'কান্দী, গোকর্ণ, লালবাগ, জিয়াগঞ্জ, বালিটুঙ্গি, খিদিরপুর, ভাবতা, বেলডাঙ্গা, বেহারিয়া, মহ্যমপুর, লালগোলা, ভাগবানগোলা, খলসেপাড়া, পাহারপুর, মালিহাটি, ভাকুড়ি, নশীপুর, দুর্গাপুর, আন্দুলিয়া, গাঁতলা, কেদারচাঁদপুর,

মহলন্দী, সর্বাঙ্গপুর, মাধুনিয়া, উগ্রা, ভাটপাড়া, ছয়ঘরি, মদনপুর, সাদিখানদিয়াড়, সুজাপুর, রামপাড়া, শক্তিপুর, ডাঙ্গাপাড়া, ধুলিয়ান, বাঁটি, রাধারঘাট, বহরমপুর প্রভৃতি এলাকা থেকে দেড় শতাধিক প্রতিনিধি শান্তি সম্মেলনে যোগদান করেন।

জেলা ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রতিষ্ঠাতা ছত্রপতি রায় সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। অনন্ত ভট্টাচার্য, আবদুল কাদের (সিপিআই) ও নীরদ সরকার (আরএসপি) জেলা শান্তি সমিতির যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হন[১]।"

পূর্ববঙ্গ থেকে আগত ছিন্নমূল উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনই তখন ছিল সবচেয়ে জরুরী কাজ। কোলকাতায় বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক মেঘনাদ সাহাকে সভাপতি ও চারুচন্দ্র রায়কে সম্পাদক করে গড়ে ওঠে ইস্টবেঙ্গল রিলিফ সোসাইটি। মুর্শিদাবাদে আর এস পি সংগঠক নিতাই গুপ্তের উদ্যোগে তৎকালীন পৌর সভাপতি মনোরঞ্জন সেনকে সভাপতি করে তার শাখা সংগঠন তৈরী হয়। বহরমপুর শহরের নানা উপকণ্ঠে কাশিমবাজার, বলরামপুর, বৈরগাছি, গোয়ালজান, হাতিনগর, হরিদাসমাটি প্রভৃতি জায়গায় উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনে এই সোসাইটির ভূমিকা অবিস্মরণীয়[২]।

১৯৪৮ সালের ১৫ই জানুয়ারি মুর্শিদাবাদের জেলাশাসক হয়ে আসেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক অন্নদাশংকর রায়[৩]। তার আগে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য রাজনীতিতেও একটা গুরুত্বপূর্ণ রদবদল হয়ে গেছে। স্বাধীনতা লাভের আগেই, যখন দেশবিভাগ হচ্ছেই এটা সবাই জেনে গেছেন তখন বিভাগোত্তর পশ্চিমবঙ্গের জন্য একটা মন্ত্রীসভা তৈরী হয়। ১৯৪৭ সালের ৪ঠা জুলাই সেই মন্ত্রীসভার প্রধান হিসাবে শপথ নেন প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ। প্রধানমন্ত্রী (তখন মুখ্যমন্ত্রীর বদলে প্রধানমন্ত্রীই বলা হত) প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ও তাঁর আট সহযোগীকে শপথ বাক্য পাঠ করান তৎকালীন গভর্ণর বারোজ[৪]। স্বাভাবিকভাবেই স্বাধীনতা লাভের পর শ্রীঘোষের নেতৃত্বাধীন এই মন্ত্রীসভাই পশ্চিমবঙ্গের শাসনভার গ্রহণ করে।

শ্রীঘোষ ছিলেন সৎ, আদর্শবাদী নেতা। সরল অনাড়ম্বর জীবনযাপনের জন্য তিনি সাধারণ মানুষের বিশেষ আস্থাভাজন ছিলেন। কিন্তু কংগ্রেসের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে এবং নিজের অনাবশ্যক অনমনীয়তার কারণে তিনি বেশীদিন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী থাকতে পারেন নি। পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসে তখন দুটো গোষ্ঠী ক্রিয়াশীল ছিল। খাদি গ্রুপ ও হুগলি গ্রুপ। শ্রীঘোষ ছিলেন খাদি গ্রুপের প্রতিনিধি। গান্ধিজীর অনুগামিতার সুযোগে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে খাদি গ্রুপের বিশেষ গুরুত্ব ছিল। হাইকমাণ্ডের প্রচ্ছন্ন পক্ষপাত ছিল খাদি গ্রুপের উপর। তাই সংগঠনের অভ্যন্তরে কমজোরী হওয়া সত্ত্বেও খাদি গ্রুপের প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার সুযোগ পান। অন্যদিকে দলের সংঘঠনে হুগলি গ্রুপ ছিল সবিশেষ শক্তিশালী। প্রফুল্লচন্দ্র সেন, অতুল্য ঘোষ, ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের মতো প্রভাবশালী নেতারা ছিলেন এই   পর নেতৃত্বে। রাজ্যের কংগ্রেসী সংগঠনের উপর এদের আধিপত্য ছিল প্রশ্নাতীত। খাদি গ্রুপ হাইকমাণ্ডের স্নেহাচ্ছায়ায় থাকার কারণে দলীয় সংগঠনে প্রভাব বিস্তারের তেমন প্রচেষ্টা করেনি বা তাদের সেরকম প্রচেষ্টা থাকলেও তা বিশেষ ফলপ্রসূ হয়নি। সংগঠনে এমন অসম বিন্যাস সত্ত্বেও খাদি গ্রুপের প্রফুল্ল ঘোষ যে পশ্চিমবঙ্গের

প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হতে পেরেছিলেন তার পিছনে হাইকমাণ্ডের সমর্থন যেমন একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল তেমনি আরো একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল হুগলি গ্রুপ নিজেদের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী পদের যোগ্য তেমন কাউকে খুঁজে পাননি। কিরণশঙ্কর রায়ের নাম তারা বিবেচনায় আনেন নি। কেননা প্রাক স্বাধীনতা যুগে তার স্বাধীন সার্বভৌম অখন্ড বাংলা গঠনের উদ্যোগ, শরৎচন্দ্র বসু ও প্রাদেশিক মুসলিম লিগের সম্পাদক আবুল হাশিমের সঙ্গে একই সুরে সার্বভৌম বাংলার দাবী তোলা প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব তথা কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ভালোভাবে নেয়নি। কাজেই ১৯৪৭ সালের ২২শে জুন অমুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলার কংগ্রেস বিধায়করা যখন তাদের নেতা হিসাবে ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষকে নির্বাচিত করেন তখনই কিরণশঙ্কর রায়ের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ স্পষ্ট হয়ে যায়। অন্যদিকে ২৩শে জুন মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলার কংগ্রেস বিধায়করা তাদের নেতা হিসাবে কিরণশঙ্কর রায়কে নির্বাচিত করেন। তাদের এই নির্বাচনেও বস্তুত আশ্চর্য হওয়ার কোন উপাদান নেই। হিন্দু প্রভাবিত সম্ভাব্য কংগ্রেসী শাসনে মুসলমানদের সম্ভাব্য বিপন্নতা যেমন মুসলমানদের উদ্বিগ্ন করে রেখেছিল তেমনি মুসলমান গরিষ্ঠ এলাকায় সম্ভাব্য লীগের শাসনে অন্য ধর্মাবলম্বীদের বিপন্নতার আশঙ্কাই ছিল কিরণশঙ্কর রায়কে নেতা নির্বাচনের পিছনে।

সে যাই হোক কংগ্রেসের হুগলি গ্রুপের নেতারা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী করতে চেয়েছিলেন বিধানচন্দ্র রায়কে। কিন্তু ডাঃ রায় নিজে মুখ্যমন্ত্রী হতে রাজী ছিলেন না। সর্বোপরি ওই সময়কালে তিনি ছিলেন বিদেশে। ফলে সর্বসম্মতিক্রমে ডঃ প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হন। ডঃ ঘোষের সততা ছিল প্রশ্নাতীত। কাজ করার সদিচ্ছাও ছিল যথেষ্ট কিন্তু তার তেমন প্রশাসনিক দক্ষতা ছিল না। ছিল না সাংগঠনিক ক্ষমতাও। মন্ত্রীসভা গঠনের সময় তাঁর মন্ত্রীসভায় অন্তর্ভুক্ত হন তপশিলী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি রাধানাথ দাস। কিন্তু মন্ত্রীসভা গঠনের মাসখানেকের মধ্যেই ডঃ ঘোষ শ্রীদাসকে পদত্যাগের নির্দেশ দেন। মন্ত্রীসভার অনেক সদস্যই এই সিদ্ধান্তের বিরোধীতা করেন ও ডঃ ঘোষকে তার নির্দেশ প্রত্যাহারের অনুরোধ জানান। ডঃ ঘোষ তার সিদ্ধান্তে অনড় থাকলে বিষয়টি হাইকমান্ড পর্যন্ত পৌঁছায় ও কংগ্রেস সভাপতি আচার্য কৃপালনিকে মিটমাটের জন্য কলকাতায় আসতে হয়। এর উপর ব্যবসায়ীরাও ডঃ ঘোষের উপর বিরূপ হয়ে ওঠেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে কালোবাজার আর চোরা কারবারের যে রমরমা দেখা দিয়েছিল ডঃ ঘোষ তা দমন করতে বিশেষ উদ্যোগ নেন। দেশব্যাপী মন্বন্তর ও দাঙ্গার সময় যে সব ব্যবসায়ী চোরাকারবার ও কালোবাজারি করে বিপুল টাকা রোজগার করেন তাদের দমন করাই পুলিশ প্রশাসনের প্রধান লক্ষ্য হয়ে ওঠে। ভেজাল খাদ্যদ্রব্য, বেআইনীভাবে মজুত সামগ্রী উদ্ধারের লক্ষ্যে পুলিশের এনফোর্সমেন্ট বিভাগ ব্যবসায়ীদের গুদামে হানা দিতে থাকে। এর ফলে পশ্চিমবঙ্গের ব্যবসায়ীমহলে ডঃ ঘোষের বিরুদ্ধে তীব্র অসন্তোষ দেখা দেয়। এমতাবস্থায় দলের ভিতরে ও বাইরের চাপে ডঃ ঘোষ স্বাধীনতার মাস কয়েকের মধ্যে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। ইতিমধ্যেই ডঃ বিধানচন্দ্র রায় দেশে ফিরে এসেছিলেন ও বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিধানসভায় নির্বাচিত হয়েছিলেন। কংগ্রেসের হুগলি গ্রুপের প্রবল চাপের মুখে ডঃ রায়

মুখ্যমন্ত্রী হতে রাজী হন। ১৯৪৮ সালের ২৩শে জানুয়ারী তাঁর নেতৃত্বে নতুন মন্ত্রীসভা শপথ গ্রহণ ক'রে পশ্চিমবঙ্গের শাসনভার কাঁধে তুলে নেয়[২]।

এইরকম পরিস্থিতিতে মুর্শিদাবাদ জেলার জেলা শাসকের দায়িত্ব নিয়ে আসেন অন্নদাশংকর রায়। মুসলিম প্রধান মুর্শিদাবাদ জেলার অবস্থা তখন বেশ ঘোরালো। জেলার মুসলমান সমাজে তীব্র অসন্তোষ। তারা তখনও আশা করছে যে মুর্শিদাবাদ আবার পূর্ব পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত হবে। গোপনে গোপনে চলছে মুসলমানদের সংগঠিত করার কাজ। আন্দোলনের ফান্ড তৈরীর জন্য চলছে চাঁদা তোলা। অন্যদিকে হিন্দুরাও আর কোনভাবেই মুসলমানদের বিশ্বাস করতে রাজী ছিল না। তাদের বদ্ধমূল ধারনা ছিল দেশবিভাগের জন্য একমাত্র মুসলমানেরাই দায়ী। 'দ্য গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং' এর স্মৃতি বাঙালি হিন্দুর স্মৃতিতে জ্বলজ্বল করছিল, ছিল নোয়াখালির দুঃসহ স্মৃতিও। তাই এহেন পরিস্থিতিতে যখন মুসলমানদের হোমল্যান্ড পাকিস্থান তৈরী হয়েছে তখন এপারের মুসলমানেরা কেন তাদের সাধের পাকিস্থানে যাবে না এমত একটা অনুচ্চারিত প্রশ্ন ছিল বাঙালী হিন্দুর মনে। হিন্দু উদ্বাস্তুরা তো চাইছিলই যে বিনিময়ের মাধ্যমে এপারের মুসলমানেরা ওপারে যাক। সেক্ষেত্রে ছিন্নমূল হিন্দুদের পুনর্বাসন অধিকতর সহজ হবে। কিন্তু আগেই বলা হয়েছে দেশবিভাগের পর এপারে যারা থেকে গিয়েছিল তারা ছিল হতদরিদ্র মুসলমান, বিনিময় করার মতো সম্পত্তি তাদের ছিলই না। পারস্পরিক সন্দেহ আর অবিশ্বাসের বাতাবরণ জেলার সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি ক্রমশ বিষিয়ে তুলছিল। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরপরই দেশের পশ্চিম সীমান্তে পাকিস্থানের হানাদারি পাকিস্থানের মতিগতি নিয়েও প্রশ্ন জাগিয়ে তুলেছিল। সম্ভাব্য পাকিস্থানি হামলা ও তা হলে মুর্শিদাবাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান, সমাজের ভূমিকা কি হবে তা নিয়ে হিন্দুদের মনে নানা প্রশ্ন ছিল — তার চেয়ে মুসলমানেরা যদি ভালোই ভালোই পদ্মাপারে চলে যায় তা হলেই মঙ্গল। যদি না যায় তাহলে কি হবে? ওদের জোর করেই পাঠাতে হবে। এমনই একটা চক্রান্তের কথা ঠারেঠোরে জানিয়েছেন মুর্শিদাবাদের তৎকালীন জেলাশাসক, তাঁর নানা স্মৃতিকথায়। যদিও শ্রীরায়ের দাবির তেমন কোন জোরাল সমর্থন অন্য কোথাও মিলছে না।

পূর্ববাংলা থেকে আগত উদ্বাস্তুদের নিয়ে রাজ্যের কর্ণধারদের তখন দিশেহারা অবস্থা। তাদের রেশন, পুনর্বাসন, চিকিৎসার ব্যবস্থা ইত্যাদি নিয়ে সরকার যখন হিমসিম খাচ্ছে তখন ঘোলাজলে মাছ ধরতে পটু একদল সুযোগসন্ধানী সরকারকে ব্যতিব্যস্ত করার লক্ষ্যে সরকারী পুনর্বাসন পরিকল্পনা বানচাল করতে উঠেপড়ে লেগেছে। মুর্শিদাবাদের জেলাশাসক অন্নদাশংকর রায় জেলার দায়িত্বভার গ্রহণ করতে হবে শুনেই অর্থমন্ত্রী অন্নদাপ্রসাদ চৌধুরীর কাছে জানতে চান যে শরনার্থী হিন্দুদের সম্পর্কে সরকারের পলিসি কি। জবাবে অর্থমন্ত্রী জানান যে সরকার যদি শরণার্থীদের উৎসাহ দেয় তবে পূর্ববঙ্গ থেকে সব হিন্দু চলে আসবে। সরকার নাস্তানাবুদ হবে। সঙ্গত কারণেই এমন পরিস্থিতি সরকারের কাম্য হতে পারে না। শ্রীরায় কটাক্ষ করেছেন যে অন্নদাপ্রসাদ চৌধুরী পশ্চিমবঙ্গীয় বলেই বোধহয় এই ধারণার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি পূর্ববঙ্গীয় হলে এমনটা বলতেন না। কেননা "পূর্ববঙ্গীয় মানসিকতা

ছিল আত্মীয়স্বজন সবাইকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে আসা। যেহেতু হিন্দুর পক্ষে বিশেষত হিন্দু নারীর পক্ষে পাকিস্থান নিরাপদ নয়।''

ডঃ বিধানচন্দ্র রায়ের ইচ্ছা ছিল যে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত হিন্দু শরণার্থীদের নিয়ে এক একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম গঠিত হবে। 'চাষী, তাঁতী, কামার, কুমোর, রাজমিস্ত্রি, ছুতোর মিস্ত্রি এদের সবাইকে নিয়ে এক একটি গ্রাম। মুদী ও ময়রা, তেলী ও গয়লা এরাও থাকবে[৮]।' কিন্তু সীমান্ত এলাকায় জমি অপ্রতুল। স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম গঠনের জন্য যতটা জমি দরকার ততটা জমি পাওয়া সম্ভব নয়। অতি উৎসাহী একদলের মত হল পাকিস্থানের সঙ্গে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী আর সে রকম যুদ্ধ হলে সীমান্তের মুসলমানদের ভূমিকা ভারতবর্ষের স্বার্থের অনুকূল নাও হতে পারে কাজেই মুসলমানদের দাও পাকিস্থানে পাঠিয়ে। দেশের পশ্চিম সীমান্তেও অবস্থা বেশ জটিল। উদ্বাস্তু সমস্যা সেখানেও তীব্রতর আকার ধারণ করেছে, পশ্চিম পাকিস্থান থেকে আগত হিন্দু ও শিখ শরণার্থীরা দিল্লিতে মুসলমানদের ঘরদোর দখল করে বসে গেছে। মুসলমানেরা এবার পাকিস্থান যাক, তাদের ফেলে আসা ঘরদোর দখল করুকগে। এ অবস্থায় গান্ধিজী বসলেন অনশনে। হিন্দুদের অনুযোগ ছিল গান্ধিজী শুধু মুসলমানদের স্বার্থ দেখেন — হিন্দুরা অত্যাচারিত হলে তার প্রাণ কাঁদে না। নোয়াখালির বীভৎস দাঙ্গার সময় তিনি হিন্দুদের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন ঠিকই কিন্তু বিহারের খবর শোনা মাত্র তিনি নোয়াখালির দাঙ্গাপীড়িত হিন্দুদের বাঘের মুখে ফেলে বিহারে চলে যান[৯]।

হিন্দু উগ্রবাদীদের মতে গান্ধিজী হিন্দুদের স্বার্থবিরোধী কাজ করেন। তিনিই হিন্দুদের পথের কাঁটা। ১৯৪৮ সালের ৩০শে জানুয়ারী এক প্রার্থনাসভায় নাথুরাম গড্‌সের গুলিতে তাঁর প্রাণ যায়। অন্নদাশংকর জানিয়েছেন যে তিনি শুনেছিলেন মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যুর রাত্রে বহরমপুরের কতক হিন্দু পরিবারে মিষ্টি বিতরণ করা হয়েছিল। এখানে শ্রীরায় কিঞ্চিৎ একদেশদর্শীতার উদাহরণ রেখেছেন। মিষ্টান্ন বিতরণের খবর দিলেও বহরমপুর তথা মুর্শিদাবাদ বাসীর স্বতস্ফূর্ত শোকের খবর তিনি দেননি[১০]।

ইতিমধ্যেই পদ্মার চর নিয়ে আন্তর্জাতিক বিবাদ বেধে যায়। মুর্শিদাবাদের চাষীরা চিরকাল পদ্মার চরে চাষ করে এসেছে। এখন পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সে চাষ করতে বাধা পায় পাকিস্থানী কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে। পাকিস্থানের দাবি পদ্মার মধ্যস্রোত পর্যন্ত পাকিস্থানের এলাকা, কাজেই চরে চাষ করতে গেলে তা হবে পাকিস্থানের জমিতে অনধিকার প্রবেশ। দখলী স্বত্ব বজায় রাখতে পাকিস্থানের লঞ্চ দাপিয়ে বেড়ায় পদ্মায়। কিন্তু সমস্যাটা অন্যখানে। খেয়ালী পদ্মার মুখ্যস্রোত কোনটা সেটা কিভাবে বোঝা যায়? ক্ষণে ক্ষণে সেই মুখ্য স্রোতের দিক বদলায়। পদ্মার মুখ্য স্রোত এই রাজসাহীর দিকে তো এই মুর্শিদাবাদের দিকে। রাজসাহীর জেলাশাসক খোন্দকার আলী তৈয়ব মুর্শিদাবাদের জেলাশাসক অন্নদাশংকরের পূর্বপরিচিত এবং একদা সহকর্মী। সেই সূত্র ধরে চিঠি চালাচালি চলে। দু পক্ষের পারস্পরিক মতবিনিময়ে সমস্যার সাময়িক সমাধান হয়। কিন্তু খোন্দকার আলী তৈয়ব বদলী হয়ে যেতেই অবস্থা আবার যে কে সেই। মুর্শিদাবাদের জেলাশাসক পুলিশকে নির্দেশ দেন পাকিস্থানী লঞ্চটাকে আটক করতে। কিন্তু পুলিশ পিছিয়ে যায়। পুলিশ সুপার বিনয় মুখার্জীর বক্তব্য পুলিশের

কাজ চোর ডাকাত ধরা পাকিস্থানী পাকড়াও করা তাদের কাজ নয়। আর সে কাজ করতে গিয়ে যদি একজনও কনস্টেবল মারা যায় সেক্ষেত্রে তার ভীষণ প্রতিক্রিয়া হবে এমনকি পুলিশবাহিনীতে বিদ্রোহও হতে পারে। মিলিটারীও এ কাজ করতে নারাজ। তাদের বক্তব্য যদি একজনও সৈন্য আরব্ধ কাজ করতে গিয়ে মারা যায় তবে তা ভারত সরকারের প্রেস্টিজে লাগবে। আর সেক্ষেত্রে ভারত পাকিস্থানের পুরোদস্তুর যুদ্ধ বেধে যাবে। এমন ঝুঁকি না নেওয়াই ভালো। তার বদলে সশস্ত্র পুলিশ দিয়ে কার্যোদ্ধার করে নেওয়াই মঙ্গলের[১১]।

সর্বোপরি এধরণের সীমান্ত কলহে দেশের প্রতিরক্ষা বাহিনীকে নামানো দুটি রাষ্ট্রের চুক্তি বিরুদ্ধ হত। পাকিস্থান এই কাজটা করেছিল বেশ সুপরিকল্পিতভাবে। তাদের বিখ্যাত বালুচ রেজিমেন্ট সামরিক খেতাব, পোশাক ও পদ প্রভৃতি সামরিক নিশানা ছেড়ে বেসামরিক বেশে সীমান্ত রক্ষার কাজে নিযুক্ত হয়েছিল[১১]। এর ফলে তাদের যুদ্ধবিগ্রহের পূর্ব অভিজ্ঞতা কাজে লাগানো যাচ্ছিল পূর্বোক্ত চুক্তি লঙ্ঘন না করেই।

পাকিস্থানের কুশলী এবং ধূর্ত সামরিক অফিসারেরা 'দখলই স্বত্বের মুখ্য প্রমাণ' এই নীতি মেনে পদ্মার মুখ্যস্রোত বরাবর কল্পিত দুদেশের বিভাজন রেখা উল্লঙ্ঘন করে মুর্শিদাবাদের কূলের দিকের অনেকটা এলাকা দখল করে নেয়। এদের সাথে টক্কর দেবার ক্ষমতা পুলিশের ছিল না। দরকার ছিল যুদ্ধবিগ্রহে অভিজ্ঞ দক্ষ বাহিনীর। ডঃ বিধানচন্দ্র রায় প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহেরুকে বুঝিয়ে সীমান্তরক্ষার জন্য ইস্টার্ণ ফ্রন্টিয়ার রাইফেলস (ই এফ আর) এবং আসাম রাইফেলসকে মোতায়েন করেন। শুধু বাহিনী থাকলেই তো হবে না। বাহিনীকে যথাযথভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজন দক্ষ পরিচালকের। সেই মতো মুর্শিদাবাদে বদলি করে আনা হল পাঁচজন সামরিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন অফিসারকে। এদের প্রত্যক্ষ যুদ্ধের অভিজ্ঞতা ছিল কিন্তু সামরিক বাহিনী ছেড়ে এরা যোগ দিয়েছিলেন ইন্ডিয়ান অ্যাডমিনিসট্রেটিভ সার্ভিসে। এরা হলেন উইং কমান্ডার ভি এস সি ব্যানার্জী, লেফটেন্যান্ট কর্ণেল আইভান সুরিটা, মেজর এস কে ব্যানার্জী, মেজর বি সি গাঙ্গুলী ও ক্যাপ্টেন জে সি তালুকদার[১১]। এদের মধ্যে এস সি ব্যানার্জী (শিবচন্দ্র ব্যানার্জী) ছিলেন এয়ারফোর্সে। যুদ্ধে বীরত্ব দেখানোর জন্য তিনি ওকপাতা পুরষ্কার পেয়েছিলেন। লেফটেন্যান্ট কর্ণেল আইভান সুরিটা ছিলেন আর্মেনিয়ান। তার রেজিমেন্ট ছিল রাজপুতানা রাইফেলস। অষ্টম আর্মিতে থেকে উত্তর আফ্রিকা-ইটালির যুদ্ধে অসামান্য বীরত্ব দেখিয়ে পরপর দুবার মিলিটারি ক্রসে ভূষিত হন। মেজর এস কে ব্যানার্জী (সুনীল কুমার ব্যানার্জী) ছিলেন ভারতবর্ষের অন্যতম প্রাচীন রেজিমেন্ট বম্বে গ্রেনেডিয়ার্স -এ। মেজর বি সি গাঙ্গুলী (ভূপেন্দ্রচন্দ্র গাঙ্গুলী) ছিলেন ইন্ডিয়ান আর্মি সার্ভিস কোরে[১২]।

ফৌজী অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রশাসকেরা দায়িত্বভার নেবার পর পরিকল্পনা হল চর অপারেশনের। ঠিক হল এখনই কিছু করা হবে না। বর্ষার জল নেমে চর জেগে উঠলেই ভারতীয় বাহিনী গিয়ে চরের দখল নেবে। দখলই তো স্বত্বের মুখ্য প্রমাণ। এভাবেই বিনা রক্তপাতে চর দখল করা যাবে। তারপর পাকিস্থানী বাহিনী যদি চর পুনর্দখল করতে চায় তো তখন দেখা যাবে। চর অপারেশনের জন্য কলকাতা এল মিলিটারি লঞ্চ। জলযুদ্ধের

উপযোগী লঞ্চগুলোতে তেমন স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা নেই। অস্ত্র রাখার জায়গা বাড়িয়ে মানুষের জন্য জায়গা কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। পমফ্রেট নামে একটা বড় লঞ্চও এল কিন্তু অগভীর পদ্মায় তার চলা মুশকিল। লঞ্চের তলা চড়ায় ঠেকে বিপদ বাড়ায়। লঞ্চ তো এল কিন্তু সারেং লস্কর সবাই চট্টগ্রাম নোয়াখালির মুসলমান। পাকিস্থানের সঙ্গে চর দখলের লড়াই-এর সময় এরা বিশ্বাসঘাতকতা করলেই মুসকিল। কিন্তু হিন্দু লস্করই বা মেলে কোথায়। মাদ্রাজ উপকূলে হিন্দু লস্করেরা থাকে। কিন্তু তাদের আনিয়ে চর অপারেশন করতে হলে তার আগেই চর বেদখল হয়ে যাবার সম্ভব্না। আর চর একবার বেদখল হলে তা পূনর্দখল করতে গেলে রক্তপাত অবশ্যম্ভাবী। সেই ঝুঁকি নেওয়া যায় না।

এরই মধ্যে জেলাশাসকের ডাক পড়ল কলকাতায়। মুখ্যমন্ত্রীর ঘরে নিভৃত বৈঠকে জেলাশাসক অবাক হয়ে শুনলেন মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ 'অমুক তারিখের মধ্যে সীমান্তের মুসলমানদের খেদিয়ে দিতে হবে।' নদীয়ার জেলাশাসক রণজিৎ কুমার রায় বললেন, এত অল্পদিনের মধ্যে একাজ করা সম্ভব নয়। আরো বেশী সময় চাই। আর্জি মঞ্জুর হয়ে গেল। সময় বাড়িয়ে দেওয়া হল কিন্তু কাজটা যথাযথভাবে হওয়া চাই। অন্নদাশংকর এতে অবাক, কেননা খবরের কাগজে সরকারী বক্তব্য সম্পূর্ণ উলটো। সরকারী বয়ান উদ্ধৃত করে খবরের কাগজ জানিয়েছে যে পশ্চিমবঙ্গ থেকে মুসলমানদের তাড়িয়ে দেওয়া হবে এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। সরকারের তেমন কোনো অভিপ্রায় নেই। মুখ্যমন্ত্রীর খাস কামরা থেকে বেরিয়েই অন্নদাশংকর নদীয়ার জেলাশাসককে বললেন, এ কাজে রক্তপাত অবশ্যম্ভাবী সেজন্য লিখিত আদেশ দেওয়া চাই। হোম সেক্রেটারী রণজিৎ গুপ্ত জানিয়ে দিলেন যে লিখিত আদেশ দেওয়া যাবে না।[১৫]

বিষয়টা তখনকার মত ধামাচাপা পড়ে গেল। শুরু হয়ে গেল চর অপারেশন। নিমতিতার গঙ্গার চর যেটা আগে পাকিস্থান দখল করে রেখেছিল সেটা দখল করে নেওয়া হ'ল। ওড়ানো হল ভারতের জাতীয় পতাকা। কিছুদিনের মধ্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী কিরণশঙ্কর রায় সদলবলে এলেন চর পরিদর্শনে। সঙ্গে এলেন প্রেসিডেন্সী ডিভিশনের কমিশনার জে এন তালুকদার। আলোচনায় আবার উঠে আসে সীমান্ত থেকে মুসলমান খেদানোর প্রশ্ন। জেলাশাসক রাজী নন তিনি বরং ইস্তফা দেবেন তবু মুসলমানের গায়ে হাত দেবেন না। মন্ত্রী রুষ্ট হলেও যাতে বিবেকের সায় নেয় তা তিনি করবেন না। এই টানাপোড়েনের মধ্যেই বদলির আদেশ এসে গেল জেলাশাসকের, নতুন জেলাশাসক হয়ে এলেন শ্রী অশোক মিত্র, আই সি এস। অশোক মিত্র দায়িত্বভার নেবার দু-একদিন আগে হোম সেক্রেটারির চিঠি এল জেলাশাসকের নামে। চিঠির বিষয়বস্তু পূর্বে যে আদেশ দেওয়া হয়েছিল (সীমান্ত থেকে মুসলমানদের খেদানোর আদেশ) তা প্রত্যাহার করা হল।

স্বাধীনতা ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের মনে যে স্বপ্ন জাগিয়েছিল, তা সার্থক হতে পারেনি। স্বপ্নভঙ্গের বেদনা দেশবাসীকে ক্লিষ্ট করছিল। সেই সময়ে জেলা তথা রাজ্যের পরিস্থিতি সুন্দরভাবে উপস্থাপিত হয়েছে রেজাউল করীমের একটা লেখায়। মুর্শিদাবাদ জেলা রাষ্ট্রীয় সমিতির পাক্ষিক মুখপত্র 'গণরাজ' এর ১৯৪৮ সালের ১৫ই আগস্টের বিশেষ

সংখ্যায় 'স্বাধীনতার এক বৎসর' শিরোনামের একটি প্রবন্ধে রেজাউল করীম লিখছেন, ''দেশ বিভক্ত, জনসাধারণের মন শান্তিশূন্য। চারিদিকে বিশৃঙ্খলা। দেশবাসী বিদ্রোহোন্মুখ, বিদেশী শাসন ও শোষণের চাপে মনুষ্যত্ব আহত, পিষ্ট ও পদদলিত। সাম্প্রদায়িকতার দাবানলে সমগ্র দেশ প্রজ্বলিত। একদিকে লীগ আর অপরদিকে মহাসভা প্রতিনিয়ত এই দাবানলে ইন্ধন যোগাইতে সতত নিযুক্ত। কোষাগার অর্থশূন্য। চোরাকারবারী মুনাফাশিকারী ও মজুতদারের শাইলক সুলভ মনোবৃত্তির প্রভাবে দেশের শেষ রক্তবিন্দু নিত্য শোষিত। সরকারী কর্মচারীগণের আমলাতান্ত্রিক স্বভাব অপরিবর্তিত। এই নিদারুণ অবস্থার মধ্যে একদল দুষ্কৃতকারী নিজেদের হীন ব্যক্তিগত সুবিধা আদায়ের জন্য সদা উদ্যত। খাদ্য ও উৎপাদনের অভাবে দেশ দুর্ভিক্ষের মধ্যে নিপতিত। সর্বোপরি বৈদেশিক শক্তির আশ্রয় ও প্রশ্রয়পুষ্ট একদল পঞ্চম বাহিনী দেশের নবলব্ধ স্বাধীনতাকে বিপর্যস্ত করিবার জন্য গোপন প্ররোচনায় নিযুক্ত।''[১৬] এটা ঠিকই যে দুশো বছরের ঔপনিবেশিক শাসনে বিপর্যস্ত প্রায় দেউলিয়া একটা দেশ স্বাধীনতার পর পরই মাথা তুলে দাঁড়াবে এটা অলীক কল্পনা কিন্তু তার সঙ্গে এটাও মনে রাখতে হবে যে ইংরেজদের সঙ্গে বিরামহীন স্বাধীনতা সংগ্রামে কংগ্রেসের ভূমিকায় দেশবাসীর প্রত্যাশার পারদ আকাশ ছুঁয়েছিল। প্রত্যাশা আর বাস্তবের এই তফাৎ জনগণের স্বপ্নভঙ্গ করেছিল। স্বপ্নভঙ্গের বেদনায় অসহিষ্ণু জনগণ শাসকদের প্রতি বিশেষ সুবিচার করেনি। প্রায় শূন্য থেকে শুরু করে একটা দেশকে গড়তে যে সময় লাগে কংগ্রেসী শাসকদের সেই সময়টা দিতে কেউ রাজী ছিল না। স্বাধীনতা এসেছে, এখন আবার দুঃখ থাকবে কেন, জনগণের মনোভাব ছিল এই ধরণের। সেই অরাজক পরিস্থিতি যে খুব অস্বাভাবিক নয়, বিশ্ব ইতিহাসে যে এর অনেক নজির আছে তার দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন রেজাউল করীম। বিশ্ব ইতিহাসে এরকম তিনটি উদাহরণ তিনি উল্লেখ করেছেন তাঁর পূর্বোক্ত লেখায়।

১। ''অরাজকতা বন্ধ করিতে আমেরিকার রাষ্ট্রনায়কগণকে কয়েকযুগ ধরিয়া স্বদেশবাসীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল।... অবশেষে বহু গৃহযুদ্ধ ও রক্তারক্তির পর আমেরিকা সুগঠিত রাষ্ট্রে পরিণত হইল।''

২। ''ফরাসী বিপ্লবের প্রচণ্ড ভূমিকম্প যখন সমগ্র ফ্রান্সকে প্রকম্পিত করিয়া সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার জয় ঘোষণা করিল তখনই কি শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল? প্রায় চল্লিশ বৎসর ধরিয়া ফ্রান্সে রক্তগঙ্গা বহিয়া গিয়াছে।... এত দুঃখ কষ্ট স্বীকার করিয়াও ফ্রান্সের বীর সন্তানগণ স্বাধীনতার আদর্শ অবনমিত করে নাই।''

৩। ''লেনিন কর্তৃক ক্ষমতা লাভের পরই দেশময় দেখা দিল নিদারুণ অন্তর্বিপ্লব। তাহার ফলে লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণ নাশ হইল।... বহুদিন পর বহু প্রাণহানির পর রাশিয়াতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল[১৭]।''

বিশ্ব ইতিহাসের প্রসঙ্গ টেনে রেজাউল করীম প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে সেই অরাজক পরিস্থিতি নিতান্তই সাময়িক ব্যাপার। দেশ নিশ্চয় মাথা উঁচু করে জগৎসভায় স্থান করে নেবে। সেজন্য কিছুটা সময় দরকার। তিনি আশাবাদী যে এমন পরিস্থিতি বেশীদিন থাকবে

না। তিনি লিখছেন, ''আমাদের গণপরিষদ শাসনতন্ত্রের যে কাঠামো রচনা করিয়াছিলেন তাহাতে সাম্প্রদায়িকতার কোন স্থান নাই। কংগ্রেসের চিরশোধিত দাবীযুক্ত নির্বাচনপ্রথা প্রবর্তনের ব্যবস্থা হইয়াছে। প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের দাবী স্বীকৃত হইয়াছে। সরকারী ব্যবস্থায় কোথাও কোনরূপ সাম্প্রদায়িকতা স্বীকৃত হয় নাই। আগামী বৎসরে যখন প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নূতন নির্ব্বাচন হইবে তখন দেশ হইতে চিরতরে সাম্প্রদায়িকতা দেউলিয়া হইয়া যাইবে। রাষ্ট্র ব্যবস্থা হইতে সাম্প্রদায়িকতা বিদায় গ্রহণ করিলে অচিরে সমাজব্যবস্থার উপরও তাহার প্রভাব পড়িবে এবং দেশ হইতে সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িকতা চিরতরে বিলুপ্ত হইবে। বিশুদ্ধ অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর নব ভারতের নূতন সমাজ জন্মলাভ করিবে। সেদিন অচিরে আসিবে।[১৮] রেজাউল করীম স্বপ্ন সওদাগর। তাঁর আশা এ দুঃসময় সাময়িক। দুঃখের আঁধার কেটে সুখের সূর্য উঠবেই। এখন সমালোচনা নয়। ধ্বংস নয়। দেশের এই দুঃসময়ে সবাই মিলে হাত লাগাতে হবে দেশ গড়ার কাজে। স্বপ্নের ভারত গড়ে তোলার কাজে সবার অংশগ্রহণই জরুরী।

জেলাশাসক হিসাবে অশোক মিত্র দায়িত্ব নেন ১৯৪৮ সালের ৮ই ডিসেম্বর। চার্জ নেবার সময় তিনি অবাক হয়ে জানলেন যে চিরাচরিত নিয়ম অনুযায়ী পরবর্তীদের ব্যবহারের জন্য জেলার সমস্যাগুলি বিশদভাবে লিখে রেখে যাবার যে বিধি আছে সেই বিধি মেনে বিদায়ী জেলাশাসক তাঁর জন্য কোন মন্তব্য লিখে রেখে যাচ্ছেন না। দেশ স্বাধীন হবার মাত্র বছর দেড়েকের মধ্যে চিরাচরিত প্রথার এই ব্যতিক্রম শ্রীমিত্রকে অবাক করলেও তাঁর কিছু করার ছিল না। শ্রী রায় জেলার সমস্যাবলী সম্পর্কে বিশদে কিছু লিখে রেখে না গেলেও মৌখিকভাবে তাঁকে কতকগুলি সমস্যা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করেছিলেন। অশোক মিত্র লিখেছেন, ''আমার পূর্বসূরী অস্পষ্ট ইঙ্গিত করে এমনভাবে এমন কথা ব্যবহার করলেন, তাতে মনে হ'ল মুখ্যমন্ত্রী ডা. বি সি রায়ের নিজস্ব মত ছিল এই সম্পূর্ণ অঞ্চল থেকে মুসলমান বাসিন্দাদের দেশের বাইরে সমূলে বহিস্কার করা। তাঁর কথায় মনে হল তাঁর মানসিক দ্বন্দ্বের কারণ এই যে মুখ্যমন্ত্রীর নিজস্ব অভীপ্সা এই হলেও সরকার এই মর্মে কখনও কোন লিখিত বা মৌখিক আদেশ জারী করেন নি। ... জেলার মুসলমান অধিবাসীদের নেতৃস্থানীয়দের সঙ্গে তিনি এ বিষয়ে কোনদিন আলোচনা করেননি, এমনকি পারতপক্ষে তাদের সঙ্গে দেখা করা বা আলাপ করা সমীচীন বোধ করেন নি, পাছে তাঁর বিরুদ্ধে মুসলমানদের প্রতি পক্ষপাতিত্বের অপবাদ রটে।''[১৯]

শ্রীমিত্রের এই সাক্ষ্য থেকে এ কথা মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে যে জেলা শাসক হিসাবে শ্রীরায় জেলাবাসীর সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে মেলামেশার চেয়ে অফিসে বসে জেলা শাসন করার বেশী পক্ষপাতী ছিলেন। পাছে কেউ কিছু বলে এই ভয়ে তিনি মুসলমানদের সঙ্গে মেলামেশা না করায় জেলাবাসীর অভাব অভিযোগ আশা আকাঙ্খার অনেকটাই তাঁর অজানা থেকে যাবার কথা। এ বিষয়ে কোন পারিষদের উপর নির্ভর করলে তাতে ভ্রান্তির সম্ভাবনা থেকে যায় অনেকটাই। অশোক মিত্রও এদিকে ইঙ্গিত করেছেন। তাঁর মনে হয়েছিল শ্রীরায় ''মনের দ্বন্দ্বে ক্লিষ্ট ছিলেন। অবশ্য এটাও সম্ভব, যাতে কাজ না করতে বা সিদ্ধান্ত না নিতে

হয়, তার জন্যেও অনেক রকম অজুহাত দ্বন্দ্ব হিসাবে উপস্থাপিত করা যায়।"[২০] অন্নদাশঙ্কর নিজেও তার একাধিক লেখায় স্বীকার করেছেন যে চাকুরি জীবনের ওই পর্যায়ে তিনি ভীষণ মানসিক দ্বন্দে ভুগছিলেন। চাকরি নিয়েই থাকবেন না অকালে অবসর নিয়ে পুরোপুরি সাহিত্যের কাজে আত্মনিয়োগ করবেন এই সিদ্ধান্ত নিয়ে দোদুল্যমানতা হয়তো তাঁর দায়িত্ব পালনের পথে অন্তরায় হয়েছিল। চাকরি থেকে অকাল অবসর নিয়ে আনুপাতিক পেনশন কতটা পাবেন তা দিয়ে সংসার চলবে কিনা এই প্রশ্নে তার মানসিক দ্বন্দ্ব[২১] হয়তো তাঁকে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে চাকরি ছাড়তে দেয়নি। সেক্ষেত্রে ইচ্ছার বিরুদ্ধে দায়িত্বের ভার বহন করতে হওয়ায় তিনি হয়তো কোনরকম ঝুটঝামেলায় না গিয়ে কোনরকমে কয়েকটা বছর কাটিয়ে দিতে চেয়েছিলেন — এমনটা মনে করা যেতে পারে। শ্রীরায় বিদায় নেবার আগে শ্রীমিত্রকে আর একটা বিষয়েও অবহিত করেছিলেন। সেটা হল ভার্ণন এস সি ব্যানার্জীর করা জেলার অবাঞ্ছিত মুসলমানদের একটা তালিকা। ওই তালিকায় জেলার প্রায় ত্রিশ হাজার অবাঞ্ছিত মুসলমান পরিবারের নাম, ঠিকানা ও জমিজমার বিশদ বিবরণ ছিল। শ্রীমিত্র এদের দেশদ্রোহীতার প্রমাণ আছে কিনা জানতে চাইলে জানতে পারেন যে কোন স্পষ্ট প্রমাণ নাই, সন্দেহের ভিত্তিতেই তালিকাটি তৈরী করা হয়েছে।

এতৎসত্ত্বেও জেলার মুসলমানদের সম্বন্ধে সরকারের পলিসিটা নিয়ে শ্রীমিত্রের সংশয় গেল না। শ্রীরায়ের ইঙ্গিত, ভার্ণন এস সি ব্যানার্জীর অবাঞ্ছিত মুসলমানদের তালিকা ইত্যাদি নিয়ে সংশয় দীর্ণ শ্রীমিত্র প্রশ্নটা তুললেন হোম সেক্রেটারি রুণু গুপ্ত, প্রেসিডেন্সী ডিভিশনের কমিশনার জে এম তালুকদার ও চীফ সেক্রেটারি সুকুমার সেনের কাছে। অশোক মিত্র লিখছেন, "প্রত্যেকেই বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন, মুখ্যমন্ত্রী বা সরকার কেউই এই মর্মে লিখিত বা মৌখিক কোন নির্দেশ বা আদেশ কখনও ব্যক্ত বা জারি করেন নি। নজির হিসাবে বললেন, দেশভাগের পর মালদার মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ কালিয়াচক থানায় সবচেয়ে হাঙ্গামা হয়। হাঙ্গামাকারীদের স্পষ্ট উদ্দেশ্য ছিল যে জেলার কিছু অংশ যাতে পুনরায় পূর্ব পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত হয়। সরকার যদি মালদাতেই সে সময়ে সে থানার কিছু মুসলমানদের উৎখাত করে বিতাড়িত করার আদেশ না দিয়ে থাকেন অথবা ব্যবস্থা না করে থাকেন, তবে মুর্শিদাবাদ জেলায় সে ব্যবস্থা অবলম্বনের কোন কারণ বা প্রশ্নই ওঠে না।"[২২] এতেও শ্রীমিত্রের সংশয় গেল না। তিনি বিষয়টি সম্পর্কে খোদ মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য জানতে চাইলেন। মুখ্যমন্ত্রীও বিষয়টিকে রাবিশ বলে উড়িয়ে দিয়ে এ বিষয়ে যাবতীয় কানাকানি চিরতরে বন্ধ করার জন্য নির্দেশ দেন।

জেলার সবচেয়ে স্পর্শকাতর বিষয়টিতে মুখ্যমন্ত্রীর স্পষ্ট মতামত জেনে নিয়ে শ্রীমিত্র নজর দিলেন জেলার সমস্যাবলীর দিকে। পূর্বসূরীর আমলে যে কাজগুলো হয়নি বা উপেক্ষিত হয়েছে অগ্রাধিকার দিয়ে সেগুলোর দিকে নজর ঘোরানো হল। মুর্শিদাবাদে তখন সমস্যার শেষ নেই। সাম্প্রদায়িক সমস্যা তো ছিলই, ছিল রাজনৈতিক সমস্যাও। সর্বোপরি ছিল পূর্ব পাকিস্থানের তরফে প্ররোচনামূলক গরু মোষ লুন্ঠন। ১৯৪৮ সালে ২৫ শে মার্চ পশ্চিমবঙ্গ সরকার সি পি আইকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। সি পি আইয়ের বহু কর্মী নেতাকে গ্রেফতার

করে পশ্চিমবঙ্গের নানা জেলে অন্তরীণ রাখা হয়। মুর্শিদাবাদ জেলাতেও এই ধরপাকড় শুরু হয়। সি পি আই-এর নানা গণসংগঠনের কর্মী নেতারাও এই ধরপাকড়ের হাত থেকে রেহাই পাননি। গ্রেপ্তার হওয়া রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের মধ্যে ছিলেন অনন্ত ভট্টাচার্য, জেলার কৃষক সমিতির প্রাক্তন সম্পাদক সনৎ রাহা, ছাত্র ও কৃষক কর্মী গৌরী ভট্টাচার্য, সুধীন সেন, ছাত্রনেতা বেণী বরাট, সমর অধিকারী (জিয়াগঞ্জ), সচ্চিদানন্দ চৌধুরী (বটাবাবু) , শংকর মজুমদার, মহঃ ফয়েজউদ্দিন, বহরমপুর কলেজের অধ্যাপক নির্মাল্য বাগচী ও মনু মজুমদার, রবি চৌধুরী (আজিমগঞ্জ), সত্যেন সমাজদ্দার, প্রশান্ত বসু, কৃষ্ণপদ নাথ, ছাত্র নেতা কমলাপতি রায়, জগৎপতি রায় প্রমুখ।[২৩]

যদিও জেলায় সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষদের উপর সি পি আই এর তেমন কোন প্রভাব ছিল না। তবুও এই ব্যাপক ধরপাকড় ও ব্যক্তি স্বাধীনতা হরণ জেলার শিক্ষিত সমাজকে শাসক শ্রেণীর প্রতি কিছুটা হলেও বিরূপ করে তোলে। ১৯৪৯ সালের ১৮ই জানুয়ারী শিয়ালদায় বাস্তুহারাদের উপর পুলিশ গুলি চালায়। পরের দিন এই গুলিচালনার প্রতিবাদে কয়েক হাজার ছাত্রছাত্রী রাইটার্স বিল্ডিং -এর সামনে বিক্ষোভে সামিল হয়। সেই বিক্ষোভ সমাবেশেও পুলিশ গুলি চালালে চারজনের মৃত্যু হয় এবং পনেরো জন আহত হয়। ক্ষোভে উত্তাল হয়ে ওঠে কলকাতা। বামপন্থীদের নেতৃত্বে বিক্ষোভ আন্দোলন ধ্বংশাত্মক চেহারা নেয়। কলকাতার রাস্তায় ট্রাম বাস পোড়ানো হয়। বারো দিন পরে কলকাতায় স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসে। সরকারও স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। কিন্তু সরকারকে স্বস্তিতে থাকতে দেওয়া বিরোধীদের মনঃপূত ছিল না। একের পর এক আন্দোলনে সরকারকে জেরবার করে তোলা বিরোধীদের প্রধান লক্ষ্য ছিল। বিক্ষোভ আন্দোলন থামতে না থামতেই ডাকবিভাগের অল ইন্ডিয়া ডাকপিওন ও নিম্নতর শ্রমিকদের কাউন্সিল ২০শে জানুয়ারীর বৈঠকে ৯ই মার্চ ভারত জুড়ে সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেয়।[২৪]

১৯৪৩ সালে গঠিত প্রথম পে কমিশনের ব্যর্থতা এবং মূল্যবৃদ্ধি জনিত কারণে কর্মীদের অসহনীয় পরিস্থিতি ডাক-তার কর্মচারীদের সর্বাত্মক আন্দোলনে নামার প্রস্তুতিতে অনুঘটকের ভূমিকা পালন করে। সর্বোপরি ১৯৪৬ সালের সফল ডাক ধর্মঘটের নজির তো ছিলই। ১৯৪৮ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর ডাক-তার কর্মীরা ধর্মঘটের জন্য প্রস্তুত আছেন কিনা তা দেখার জন্য কর্মীদের মধ্যে 'স্ট্রাইক ব্যালট' নেবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। ১৯৪৮ সালের শেষ থেকে ১৯৪৯ সালের প্রথম ২-৩ সপ্তাহ সারা ভারতের ডাক-তার কর্মীদের মতামত এভাবে সংগ্রহ করা হল। মুর্শিদাবাদ জেলাও সেই প্রস্তুতিতে পিছিয়ে থাকল না। জেলার ৩৫০ জন ইউনিয়ন কর্মীর মধ্যে ২৮৯ জন ধর্মঘটের পক্ষে মত প্রকাশ করেন। ঠিক হল ১৯৪৯ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারী ইউ পি টি ইউ -এর সুপ্রিম কাউন্সিল মাদ্রাজের সভায় ধর্মঘট বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে। শেষ পর্যন্ত এই ধর্মঘট প্রত্যাহৃত হয়।[২৫]

১৯৪৯ -এর ২৬শে ফেব্রুয়ারী আর একটি ঘটনা সারা বাংলাকে হতচকিত করে তোলে। ঐদিন একদল সশস্ত্র লোক কয়েকটি ছোট ছোট গ্রুপে বিভক্ত হয়ে দমদম বিমান ঘাঁটি, জেসপ কারখানা, যশোহর রোডের অস্ত্রশস্ত্র তৈরীর কারখানা একসঙ্গে আক্রমন করে।

দমদম বিমানবন্দরে তিনজনকে খুন করা হয়, আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় একটা বিমানে। জেসপ কারখানার জলন্ত চুল্লিতে তিনজন বিদেশীকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা হয়। ৪ঠা মার্চ বিধানসভায় বিবৃতি দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জানান আর সি পি আই দল ছিল এই ঘটনার পিছনে। তাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সি পি আই -ও ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করেছিল।[২৬]

ঐ বছরই মুর্শিদাবাদে আরেকটি ঘটনা ঘটেছিল যা হলদির লড়াই নামে বিখ্যাত। হলদি গ্রামটি কান্দী মহকুমার সাবলদহ অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত একটি দুর্গম গ্রাম। ঐ গ্রামের কুখ্যাত জোতদার ছিল সীতেশ ঘোষ ও তার ভাই ক্ষিতেশ ঘোষ। কান্দীতে তখন আর সি পি আই -এর বেশ ভালো সংগঠন ছিল। সীতেশ ঘোষরা তাদের বাড়ির 'বাগাল' (যে বাড়ি ও জমির সমস্ত কাজ দেখাশোনা করে) কে প্রচন্ড মারধোর করে কাজ থেকে ছাড়িয়ে দিলে ঘটনার সূত্রপাত হয়। সীতেশ ঘোষেরা ছিল কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত এবং এলাকার অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তি। তাদের ঐ কুকর্মের প্রতিবাদে 'কৃষক সমিতি' আশেপাশের গ্রামগুলিতে সশস্ত্র মিছিল বার করে। এরপর গণ আদালতে সীতেশ ঘোষের বিচার হয়। বিচারে তার ১০০১ টাকা জরিমানা ও দশ হাত নাক খত্তা দেওয়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ১৯৪৯ সালের ৫ই আগষ্ট এক সশস্ত্র মিছিল সীতেশ ঘোষের বাড়িতে চড়াও হয় এবং তাকে একটি হলফনামায় সহি করতে বলা হয়। সশস্ত্র মিছিল দাবী করে যে সীতেশ ঘোষকে বেরিয়ে এসে সকলের সামনে দশ হাত নাক খত্তা দিতে হবে, ১০০১ টাকা ও তাদের বন্দুকটি গণবাহিনীর হাতে তুলে দিতে হবে। অবস্থা বেগতিক দেখে সীতেশ ঘোষ ও তার কুকর্মের অন্যতম সাকরেদ গণেশ মণ্ডল দশ হাত নাক খত্তা দিতে বাধ্য হন। আর সি পি আই ডাক দেয় 'হলদির লড়াই বিশ্বের লড়াই।' এ লড়াই -এর পিছনে ছিল পান্নালাল দাশগুপ্তের বিশ্বাস, মুক্ত এলাকা তৈরী করে সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের লক্ষ্যে শুরু করতে হবে লড়াই। এরপরই হলদি এবং তার পাশ্ববর্তী আর সি পি আই প্রভাবিত গ্রামগুলিতে নেমে আসে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস। হলদি, বরুটিয়া, কুন্ডল, ঝিকরহাটিতে বসানো হয় পুলিশ ক্যাম্প। জিজ্ঞাসাবাদ ও তল্লাসীর নামে শুরু হয় পুলিশি বর্বরতা। হলদির লড়াই এর অন্যতম নেতা অরুণ ঘোষ (হলদি), রাধাকিঙ্কর ঘোষ, শরৎ গড়াই প্রমুখদের পুলিশ গ্রেপ্তার করে। বিচারে হলদির ন'জন এবং বরুটিয়ার তিনজনের তিনমাস করে কারাদন্ড দেওয়া হয়। ঘটনার সাথে যুক্ত থাকার জন্য প্রাথমিক শিক্ষক অরুণ ঘোষ (হলদি) এবং রাধিকা দাসকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়। হলদির লড়াই ব্যর্থ হলেও পরবর্তীকালের অনেক কৃষক আন্দোলনের প্রেরণা যে ছিল হলদির স্মৃতি তা বলাই বাহুল্যমাত্র।[২৭]

১৯৪৯ এর এপ্রিল মাসে বেশ কিছু রাজবন্দীকে বহরমপুর জেলে স্থানান্তরিত করা হয়। রাজবন্দীরা ছিলেন মূলত আর সি পি আই, ফরওয়ার্ড ব্লক ও সি পি আই কর্মী। এই সময় রাজবন্দীরা নিজেদের জন্য অতিরিক্ত সুযোগ সুবিধা দাবী করে আন্দোলনে নামে। আন্দোলনের অঙ্গ হিসাবে পর পর দুবার অনশন ধর্মঘট হয়। ধর্মঘটী রাজবন্দীদের দাবী ছিল যে তারা নিজেদের খাবার দাবার ব্যবস্থা নিজেরাই করবেন এবং সেজন্য প্রয়োজনীয় এবং তাদের মনমত জিনিসপত্র কেনার স্বাধীনতা তাদের দিতে হবে, জামাকাপড় এবং অন্যান্য

আবশ্যকীয় জিনিস কেনার জন্য মাসিক ভাতা বরাদ্দ করতে হবে, পরিবার পোষণের ভাতা দিতে হবে, মার্কসিস্ট লেনিনিস্ট সাহিত্য কেনার স্বাধীনতা দিতে হবে, জেলের সেলের তালাচাবি সন্ধ্যা ছ'টার বদলে রাত্রি আটটায় দেবার ব্যবস্থা করতে হবে, জেলের এক একটি কুঠুরিতে চারজনের বেশী বন্দী রাখা চলবে না, স্নান পায়খানা ব্যবস্থার উন্নতি করতে হবে সর্বোপরি রাজবন্দীদের কাউকেই কুখ্যাত বক্সাদুয়ার বন্দীশিবিরে পাঠানো চলবে না।

প্রথমবার অনশন ধর্মঘট বহরমপুরে না হলেও অন্যান্য জেলে এই অনশন হয় এবং আলিপুর জেলে দু'জন বন্দী মারাও যান। সরকার বাধ্য হয়ে রাজবন্দীদের অধিকাংশ দাবী মেনে নেন। আগষ্ট মাসে দ্বিতীয়বারের অনশন ধর্মঘটে বহরমপুর জেলের বন্দীরাও সামিল হয়। বন্দীদের দাবীর কাছে প্রথমবার পিছু হটতে বাধ্য হওয়ায় এবারে সরকার দৃঢ় অবস্থান নেয়। তারা চাপের কাছে নতিস্বীকার করতে অস্বীকার করে এবং প্রয়োজনে বন্দীদের উপর বলপ্রয়োগ করা হবে এমন সিদ্ধান্ত নেয়। বহরমপুর জেলে বন্দীদের মধ্যে তৎকালীন জেলাশাসক শ্রীমিত্রের ব্যক্তিগত বন্ধু দেবীভূষণ ভট্টাচার্যও ছিলেন। অনশনজনিত কারণে বন্ধু এবং অন্য কয়েকজন বন্দীর শারীরিক অবস্থার অবনতি লক্ষ্য করে জেলাশাসক সরকারের নীতি অমান্য করে রাজবন্দীদের মুখ্য দাবিগুলো মেনে নেন। জেলাশাসকের এহেন অবাধ্যতা ও নিয়ম লঙ্ঘনে সরকার রুষ্ট হলেও জেলাশাসকের মুখরক্ষার্থে ও সর্বসমক্ষে তাঁর প্রতি সরকারের আস্থা জাহির করতে সরকার শ্রীমিত্রের কাজে সম্মতি দেয়।[২৮]

রাজনৈতির এই অস্থিরতা, তীব্র সরকার বিরোধী আন্দোলন ও সেই আন্দোলন দমনে সরকারের কঠোর থেকে কঠোরতর দমননীতির প্রয়োগ একদিকে যেমন জনগণকে বিক্ষুব্ধ করে তুলছিল অন্যদিকে তেমনি সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতিও ক্রমশ জটিল হয়ে উঠছিল। জেলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান সমাজ তখন নেতৃত্বহীনতায় ভুগছে। মুসলমান সমাজ থেকে উত্থিত যে সব নেতারা তখন সক্রিয় রাজনীতিতে যুক্ত ছিলেন তাদের উপর সাধারণ হতদরিদ্র মুসলমানদের তেমন আস্থা ছিল না। এই সব সাধারণ মুসলমানদের আস্থা ভাজন নেতারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেশ ত্যাগ করায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় মুসলমান সমাজে স্থানীয় স্তরের কিছু মোড়ল মাতব্বর নেতা হয়ে বসে — যাদের না ছিল ণত্বষত্ব জ্ঞান, না ছিল কোন দূরদর্শিতা। মুসলমান সমাজে ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠতার অভিমান। পূর্ববঙ্গ থেকে আগত ছিন্নমূল উদ্বাস্তুদের সঙ্গে ছোট খাটো স্বার্থের সংঘাতে তাদের স্বাজাত্যাভিমান চাগিয়ে ওঠে। আমরাও কিছু কম যাই না — এই মনোভাব থেকে শুরু হয়ে যায় যত্রতত্র গো হত্যার প্রদর্শনী। জেলার সংখ্যালঘিষ্ট হিন্দুরা মুসলমানদের এই রকম বেয়াদপিতে (?) যারপর নাই রুষ্ট হয় এবং তাদের ক্ষোভ ধূমায়িত হতে থাকে। প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ জহর সেন লিখছেন "পূর্ব পাকিস্থানের সীমান্তবর্তী অঞ্চল হিসাবে মুর্শিদাবাদ জেলার পরিস্থিতি ছিল অগ্নিগর্ভ। অগণিত বাস্তুহারা শরণাগত মানুষের সমস্যায় দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো ছিল বিপর্যস্ত এবং সামাজিক জীবন ছিল বিপন্ন। ধর্ম সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি জটিল হয়ে উঠেছিল যত্রতত্র গো হত্যার ফলে।"[২৯] এই পরিস্থিতির প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায় জাতীয়তাবাদী দার্শনিক রেজাউল করীমের লেখায়। 'গণরাজ' পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষ যষ্ঠ সংখ্যায় (২৯ জুন ১৯৪৯) শ্রী করীম 'মুর্শিদাবাদ

জেলার মুসলমান সমাজের প্রতি নিবেদন' শিরোনামে পত্রাকারে একটি প্রবন্ধ লেখেন। ঐতিহাসিক এই লেখাটি নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ। নিজেকে 'খাকসার' পরিচয় দিয়ে তাঁর মুসলমান ভাইদের সম্বোধন করে ঐ প্রবন্ধে রেজাউল করীম মুসলমানদের কর্তব্য করণীয় সম্পর্কে কিছু অসাধারণ পরামর্শ দিয়েছিলেন। শ্রীকরীম লিখছেন "দেশ হইতে যাহাতে সর্ব্বপ্রকার সম্প্রদায়গত পার্থক্য চিরতরে লোপ পায়, যাহাতে ভারতের সর্ব্বশ্রেণীর নাগরিকগণ সকল ভেদাভেদ দূর করিয়া সকল বৈষম্য লুপ্ত করিয়া এক জাতীয়তার মহান আদর্শকে রূপ দিতে পারে, তাহার জন্য সেই মহান আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য হিন্দু-মুসলমান নির্ব্বিশেষে সকলেরই একমনে সাধনা করা একান্ত কর্তব্য। দেশের সকল শ্রেণীর লোক যদি আমাদের এই ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের ঐহিক আদর্শকে মনে প্রাণে গ্রহণ করে এবং নিজেদের আচরণ দ্বারা, আদর্শ দ্বারা ও জীবনের দৈনন্দিন কর্ম দ্বারা আদর্শকে ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করে তবে অচিরেই দেশ হইতে সর্ব্বপ্রকার সাম্প্রদায়িকতার মূল উৎপাটিত হইয়া যাইবে। তাহার ফলে ভারতবর্ষ একটি ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী দেশ ও সুমহান রাষ্ট্রে পরিণত হইবে। রাষ্ট্র গঠনের এই দায়িত্ব পালনের জন্য এই আদর্শকে রূপ দেবার জন্য আজ এই জেলার সকল শ্রেণীর অধিবাসীকে বিশেষত মুসলিম সমাজকে আকুল আহ্বান জানাইতেছি।"[১০]

হিন্দুদের সঙ্গে মুসলমানদের বিবাদের একটা প্রধান কারণ গো-বধ। দেশের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামার পেছনে বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই দুটো কারণের যে কোন একটা অথবা দুটোকে উপস্থিত থাকতে দেখা যায়। এই দুটো কারণের একটা হল গো-বধ আর অন্যটা হল ধর্মস্থানের সামনে বাদ্য যন্ত্র সহকারে শোভাযাত্রার সমারোহ। গো-বধ কি ইসলাম ধর্মের অপরিহার্য অঙ্গ? গো-বধ না করলে ইসলাম ধর্মবলম্বীর ধর্মাচরণে কি কোন ভয়ানক ক্ষতি হয়ে যেতে পারে? রেজাউল করীম লিখছেন, "স্থান কাল পাত্র ভেদে প্রত্যেকটি অধিকার প্রয়োগে তারতম্য হইয়া থাকে। বৃটিশ ভারতে যাহা সচল ছিল তাহা এখন অচল করিয়া থাকে। বৃটিশ ভারতে যাহা সচল ছিল তাহা এখন অচল করিয়া দিলে ইসলাম অশুদ্ধ হইয়া যাইবে না। তাছাড়া গো-বধের অধিকার ইসলামের মূলনীতি নহে, ধর্ম্মের অপরিহার্য্য অংশও নহে। খুব জোর বলা যাইতে পারে যে ইসলাম গো-বধের অনুমতি দিয়াছে। কিন্তু অনুমতি এক কথা আর অপরিহার্য কর্তব্য স্বতন্ত্র কথা। গো-বধ অপরিহার্য্য কর্তব্য নহে। সুতরাং ঐহিক কোন সুবিধার জন্য গো-বধ বন্ধ করিলে ইসলামের কোন বিধানই লঙ্ঘন করা হইবে না। দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় গো-বধের অধিকার আদায় করিতে গিয়া নিজেদের নিরাপত্তাকে ক্ষুন্ন করা দূরদর্শিতার পরিচায়ক নহে। আপনাদিগকে বিবেচনা করিতে হইবে এদেশের হিন্দু ভ্রাতাদের সহিত বিরোধ বাধিতে পারে এমন সব বিষয়গুলি অনর্থক জাগাইয়া রাখাতে মুসলিম সমাজের কোন লাভ নাই। বিরোধের কারণগুলিকে অপসারিত করিয়া হিন্দু ভ্রাতাদের স্নেহ ভালবাসা অর্জনই প্রকৃত সমাজসেবা।"[১১]

সাম্প্রদায়িক সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে মুসলমান সমাজের অনুসরণের জন্য রেজাউল করীম তিনটি উপায় বাতলেছেন

১. উন্মুক্ত স্থানে যাহাতে গোবধ না হয় তাহার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে

হইবে। যে সব গ্রামে গোবধের প্রথা প্রচলিত আছে, সেই সব গ্রামে একটি নিভৃত স্থান নির্দিষ্ট করিয়া রাখিতে হইবে। সেই স্থান ব্যতীত অন্য কোথাও গোবধ করা চলিবে না। এই নীতিটি যাহাতে জেলার সর্বত্র প্রতিপালিত হয় তাহার জন্য জনমত গঠন করিতে হইবে।

২. নিতান্ত প্রয়োজন ব্যতীত যাহাতে গোবধ না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

৩. সরকার যখন গো-বধ নিষিদ্ধ করেন নাই তখন দেশ হইতে গোবধ সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করা সম্ভব হইবে না। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে গো মাংসের বিনিময়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সম্প্রদায়ের স্নেহ ও ভালবাসার মূল্য অনেক অধিক। সুতরাং ক্রমে ক্রমে গো-বধ কমাইতে হইবে। ছাগল, ভেড়া, হাঁস, মুরগির চাষ অধিক পরিমানে বাড়াইতে হইবে। তাহা হইলে পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব হইবে না। অথচ সেই সঙ্গে বহুকালের কলহ বিবাদের একটা প্রধান কারণ সহজেই অপসারিত হইয়া যাইবে।[২২]

রেজাউল করীমের এই পরামর্শ জেলার সাধারণ মুসলমানদের কাছে খুব গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছিল এমন মনে করার কোন কারণ নেই। তবু তিনি উদ্যম হারাননি। অন্তহীন লেখালেখির মাধ্যমে মানুষের শুভবুদ্ধির জাগরণ ঘটিয়ে তিনি দেশবাসীকে সাম্প্রদায়িকতার পথ থেকে সরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন।

রাজনৈতিক সমস্যা সাম্প্রদায়িকতার সমস্যার পাশাপাশি জেলার আরেকটা বড় সমস্যা ছিল সীমান্ত সংক্রান্ত কলহ। সেটা দুটো পৃথক রাষ্ট্রের বিষয় হলেও রাজায় রাজায় যুদ্ধে বেচারা উলুখাগড়ার মতো অবস্থা ছিল মুর্শিদাবাদ জেলার সীমান্ত বাসীদের। পদ্মার মুখ্য স্রোত বরাবর কল্পিত বিভাজন রেখার উল্লঙ্ঘন হয়েছে বলে রাজশাহীর লোকেরা হামেশাই এজেলার লোকেদের গরু মোষ ধরে নিয়ে যেত। সীমান্ত রক্ষায় নিযুক্ত রক্ষীদের পাশাপাশি পূর্বপাকিস্থানের সাধারণ লোকেদেরও এ বিষয়ে যারপরনাই আগ্রহ ছিল। সত্যের খাতিরে বলা দরকার তার প্রতিক্রিয়ায় এপারের সীমান্তরক্ষী বা সাধারণ লোকজনও সুযোগ পেলেই অন্যপক্ষের গরু মোষ ধরে আনত। এই সমস্যা দুই দেশের উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষেরও অজানা ছিল না। আপোষে এইসব ছোটখাটো সমস্যাদি মিটিয়ে নেবার জন্য তখন মাঝে মধ্যেই দুই দেশের চীফ সেক্রেটারির মিলিত কনফারেন্স হত। ১৯৪৯ সালের ৯ই এপ্রিল কলকাতায় অনুষ্ঠিত দুই বাংলার চীফ সেক্রেটারির কনফারেন্সে উপস্থিত ছিলেন মুর্শিদাবাদের জেলা শাসক শ্রীঅশোক মিত্র। ত্রৈমাসিক ঐ আলোচনায় দুপক্ষ থেকেই মুর্শিদাবাদ রাজশাহী পরিস্থিতি নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করা হয়। এই প্রথম তিনমাসের মধ্যে সীমান্তে কোন উল্লেখযোগ্য হাঙ্গামা হয়নি। কনফারেন্সে ঠিক হল যে পারস্পরিক সহযোগিতার নিদর্শন হিসাবে যে পক্ষ যতগুলি গরুমোষ চুরি করেছে অন্যপক্ষ সেই সংখ্যার বদলে তাদের ধরা ততগুলি গরুমোষ ফেরত দেবে। পূর্ব পাকিস্থানের চীফ সেক্রেটারি আজিজ আহমেদের এই প্রস্তাবে পশ্চিমবঙ্গের চীফ সেক্রেটারি সুকুমার সেন হতভম্ব। রাজশাহীর লোকেরা চুরি করেছে ৩৩২ টি প্রাণী আর এপারের লোকেদের হেফাজতে আছে ওপারের ৩২০ টি প্রাণী। ৩৩২ এর বদলে ৩২০টি প্রাণীর বিনিময় হবে কি করে? অশোক মিত্র পরামর্শ দিলেন বিষয়টি পরবর্তী মিটিং -এর জন্য মুলতুবী থাক। এর মধ্যে এপারের লোকেরা আরো ১২টি প্রাণী

ধরে নেবে। তখন আর ৩৩২টির বিনিময়ে ৩৩২টি প্রাণী দিতে অসুবিধা থাকবে না। দুপক্ষেই খুশী হয়ে সেই সমঝোতা মেনে নিলেন।[৬৬]

এখানে বলে রাখা দরকার র‍্যাডক্লিফের যে অ্যাওয়ার্ডের মাধ্যমে ভারত এবং পাকিস্থানের সীমারেখা নির্দ্ধারিত হয়েছিল তাতে কিছু অস্পষ্টতা থাকায় দুই প্রতিবেশীর মধ্যে সীমান্ত কলহ শুরু হয়। দুপক্ষই এ সমস্যা মেটাতে আগ্রহী হওয়ায় ১৯৪৮ সালের ১৪ই ডিসেম্বর নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত দুদেশের সম্মেলনে সীমান্ত সমস্যা মেটানোর লক্ষ্যে একটি ট্রাইবুন্যাল গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই ট্রাইবুন্যালে ভারতের প্রতিনিধি নির্বাচিত হন মাদ্রাজ হাই কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত মাননীয় বিচারক শ্রী চন্দ্রশেখর আইয়ার। পাকিস্থানের প্রতিনিধি নির্বাচিত হন ঢাকা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারক মহম্মদ সাহাবুদ্দিন। দু'দেশের সম্মতিক্রমে এই ট্রাইবুন্যালের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন সুইডেনের সুপ্রিম কোর্টের মাননীয় সদস্য অ্যালগট বাগে[৬৭]।

দু'দেশের সীমান্ত বিবাদের ক্ষেত্রে পশ্চিম সীমান্তে তেমন কোন অসুবিধা ছিল না। সমস্যা ছিল পূর্ব সীমান্তে। প্রাক স্বাধীনতা যুগের মালদা জেলার নবাবগঞ্জ ও শিবগঞ্জ থানা যুক্ত রাজশাহীর সঙ্গে মুর্শিদাবাদ জেলার সীমান্ত নিয়ে কিছু অস্পষ্টতা ছিল। দুদেশের সীমান্ত নিয়ে আরেকটি সমস্যা ছিল যেখানে গঙ্গা থেকে মাথাভাঙ্গা নদীর উৎপত্তি হয়েছে বলে র‍্যাডক্লিকের অ্যাওয়ার্ডে দেখানো হয়েছিল সেখান থেকে মাথাভাঙা দৌলতপুর ও করিমপুর থানার মধ্যবর্তী সীমান্ত স্পর্শ করছে সেই জায়গাটুকু নিয়ে।

স্টকহোমের অ্যাপিল কোর্টের বিচারক মাননীয় জি ডি সাইডো (G. D. Sydow) কে ট্রাইবুন্যালের সেক্রেটারি জেনারেল নিযুক্ত করা হয়। কলকাতার বিধানসভা ভবনে ১৯৪৯ সালের ৫ই ডিসেম্বর থেকে ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত ট্রাইবুন্যালের শুনানি চলে। পূর্ব পাকিস্থানে এই শুনানি চলে ঢাকার বিধানসভা ভবনে ১৯৫০ সালের ৪ঠা জানুয়ারী থেকে ১২ই জানুয়ারী পর্যন্ত। শুনানিতে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন পশ্চিমবঙ্গের অ্যাডভোকেট জেনারেল এস এম বোস। তাকে সাহায্য করার জন্য ছিলেন মেসার্স এম এম ঘোষ, বার অ্যাট ল; এম এম সেন, বার অ্যাটল, কে বাগচী, অ্যাডভোকেট এবং কে কে সেন প্লীডার। অন্যদিকে কলকাতার শুনানিতে পাকিস্থানের প্রতিনিধিত্ব করেন ডব্লু ডব্লু কে পেজ। তাকে সাহায্য করার জন্য ছিলেন পূর্ব পাকিস্থানের অ্যাডভোকেট জেনারেল মেসার্স ফয়েজ আলি এবং অ্যাডভোকেট জনাব মেসবাহুদ্দিন। অন্যদিকে ঢাকার শুনানিতে পাকিস্থানের প্রতিনিধিত্ব করেন ফয়েজ আলি এবং তাকে সাহায্য করেন অ্যাডভোকেট মেসার্স মনসুর আলম এবং অ্যাডভোকেট জনাব মেসবাহুদ্দিন।

এই শুনানির রিপোর্ট লেখেন ট্রাইবুন্যালের সেক্রেটারি জেনারেল এবং শেষ দিন শুনানির শেষে ট্রাইবুন্যালের চেয়ারম্যান জানিয়ে দেন যে মাসখানের মধ্যেই ট্রাইবুন্যালের সিদ্ধান্ত দুদেশের সরকারকে লিখিতভাবে জানিয়ে দেওয়া হবে।

বাউন্ডারী কমিশনের মুসলিম ও অমুসলিম সদস্যেরা যেমন বাউন্ডারি বিষয়ে কোন সহমতে আসতে পারেননি ঠিক তেমনভাবেই ব্যাগে ট্রাইবুন্যালেও ভারত ও পাকিস্থানের

প্রতিনিধি সমাধান বিষয়ে একমত হতে পারেন নি। ফলে এক্ষেত্রেও চেয়ারম্যানের সিদ্ধান্তই কার্যত ট্রাইবুন্যালের সিদ্ধান্ত হয়ে ওঠে। তবে একথাও উল্লেখনীয় যে প্রথম সমস্যার ক্ষেত্রে ট্রাইবুন্যালের চেয়ারম্যান ভারতের প্রতিনিধির সঙ্গে একমত হন। প্রথম সমস্যাটির ক্ষেত্রে ট্রাইবুন্যালের সিদ্ধান্ত ছিল যে ১৯৪০ সালের ১১ই নভেম্বর জারী করা ১০৪১৩ জুর সংখ্যক নোটিফিকেশন অনুযায়ী ম্যাপে (অ্যানেক্সার-বি) দেখানো ভৌম সীমান্ত (Land boundary) এবং আরো নীচের দিকে গঙ্গার মুখ্য খাতের প্রধান স্রোত দুই দেশের সীমান্ত। তবে এই স্রোত ১৯৪৭ এর ১২ই আগষ্ট স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফের অ্যাওয়ার্ড দানের সময় যেখানে ছিল সেটিকেই সীমান্ত বলে মেনে নিয়ে দুপক্ষকে সীমান্ত চিহ্নিত করতে হবে।

যদি এভাবে সীমান্ত চিহ্নিত করণ অসম্ভব হয় তবে চিহ্নিত ভৌম সীমান্তের পাশাপাশি গঙ্গার মুখ্য খাতের প্রধান স্রোতকেই দুদেশের সীমান্ত বলে মেনে নিতে হবে আর সেক্ষেত্রে অ্যাওয়ার্ড দানের সময় নয়, যখন সীমান্তরেখা চিহ্নিত হবে তখনকার মুখ্য স্রোতকেই সীমান্ত বলে চিহ্নিত করতে হবে। আর এই কাজটা করার জন্য ট্রাইবুন্যাল সর্বাধিক এক বছরের সময়সীমা বেঁধে দেয়।[২২]

একইভাবে ট্রাইবুন্যাল নদীয়া সীমান্তে সমস্যাও দূর করার চেষ্টা করে। যদিও এই ট্রাইবুন্যালের রায়ে সীমান্ত সমস্যা একেবারে দূর হয়নি (কোথাও কোথাও এখনও তা চলছে) তথাপি ছোটখাটো অনেক বিবাদ যে এড়ানো গেছিল তা বলাই বাহুল্য মাত্র।

সাম্প্রদায়িক সমস্যা সীমান্ত সমস্যার মতোই তখন জেলার অন্যতম প্রধান সমস্যা ছিল কৃষক শ্রমিকদের তীব্র অসন্তোষ ও তাদের গণরোষ। স্বাধীনতা পরবর্তীকালেও কৃষকদের অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। স্বাধীন ভারতবর্ষে ভারতবর্ষের ধনিক মহাজন শ্রেণী, জমিদার প্রভৃতি বিত্তশালী লোকেরা স্বাভাবিক ভাবেই কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিল। গ্রামীণ সমাজে নেতা বলতে মোড়ল মাতব্বরেরা। সাধারণ মুসলমানেরা নিরাপত্তাজনিত কারণে কংগ্রেসের পতাকাতলে আশ্রয় নিয়েছিল। সর্বোপরি কংগ্রেস ইংরেজদের সঙ্গে লড়াই করে স্বাধীনতা এনেছে কাজেই তাদের অনুরাগী সমর্থক তো ছিলই। ফলে তাদের জনসমর্থন ছিল প্রবল। সাধারণ কৃষক চাষীর মনে অসন্তোষ থাকলেও স্রোতের বিরুদ্ধতা করা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। সেই অসম্ভবও ধীরে ধীরে সম্ভব হয়ে উঠল বামপন্থীদের নেতৃত্বে। এখানে বলে রাখা দরকার ১৯৪৫-৪৬ সালের বিখ্যাত তেভাগা আন্দোলন জেলাতে প্রায় হয়নি বললেই চলে। নামমাত্র যেটুকু আন্দোলন জেলাতে হয়েছিল তা হয়েছিল ভাগীরথীর পশ্চিমে সাগরদীঘি ও নবগ্রাম থানা এলাকায়। চল্লিশের দশকের প্রথমদিকে হক মন্ত্রীসভার বঙ্গীয় কৃষি ঋণ মকুব আইনও মুর্শিদাবাদ জেলায় তেমনভাবে প্রয়োগ করা হয়নি। জেলাশাসক শ্রীঅশোক মিত্র লিখেছেন, "১৯৪৫-৪৬ সালে উত্তরবঙ্গে তেভাগা আন্দোলন যখন জোরদার হয় তখন মধ্য, দক্ষিণ, ও পশ্চিমবঙ্গে এ আন্দোলন যাতে প্রবেশ না করতে পারে তার জন্য কংগ্রেস ও কম্যুনিস্ট পার্টির অধিকাংশ সভ্যরা এ আন্দোলনের বিরুদ্ধে নীরব ও সার্থকভাবে হাত মেলান। কারণ কম্যুনিস্ট পার্টির অধিকাংশ ক্ষমতাশালী সদস্য ছিলেন ভূমিসত্বভোগী, নিজ হাতে চাষ না করা, ভাগচাষীর-মেহনত-জাত উপসত্ত্বভোগকারী সমাজের। কাজে

কাজেই বাংলার এইসব ভৌগোলিক ও সামাজিক অংশে বঙ্গীয় কৃষিঋণ আইন চালু করার বিরুদ্ধে তাদের স্বার্থও জড়িয়ে ছিল।"[২৬]

তবে এইসব বিষয়গুলির মূল ছিল আরো গভীরে। ভূমি ব্যবস্থার উন্নতি ও তার সাথে সাথে কৃষকদের জীবনের মানোন্নয়নের জন্য সরকারী কমিশনের সুপারিশ যথাযথভাবে কার্যকর করার জন্য সরকার প্রস্তুত ছিল না — কেননা সেক্ষেত্রে সরকারের মূল স্তম্ভগুলি বিগড়ে যেতে পারত। ১৯৪১ সালের জুলাই মাসে বঙ্গের ভূমিরাজস্ব ও সংশ্লিষ্ট যাবতীয় বিষয়ের উপর ফ্লাড (Floud) কমিশনের যে রিপোর্ট প্রকাশিত হয় তাতে সুপারিশ করা হয় যে এতদিন পর্যন্ত ভাগচাষীদের যে হারে ফসলের ভাগ দেওয়া হত তা বাড়াতে হবে। ১৯৪৩ সালের ভয়ঙ্কর মন্বন্তর বিষয়ক উডহেড কমিশনের যে রিপোর্ট ১৯৪৫-৪৬ সালে প্রকাশিত হয় তাতেও ফ্লাড কমিশনের সুপারিশ রূপায়নের উপর জোর দেওয়া হয়।[২৭] তাতে খুব স্পষ্ট করেই বলা হয় যে ভাগচাষী ও বন্ধকী চাষী মজুরদের ফসলের অংশ আগের ধার্য হার থেকে বাড়াতে হবে।

এই সুপারিশগুলি কার্যকর করার ক্ষেত্রে সরকারের বাস্তব অসুবিধা ছিল। কেননা তখন পর্যন্ত গ্রামের ভোটের রাজনীতি নিয়ন্ত্রিত হত গ্রামীণ মোড়ল মাতব্বরদের কথায়। গ্রামীণ সমাজে তাদের শোষণের স্টীম রোলার চললেও তাদের অমান্য করার সাহস ছিল না সাধারণ মানুষদের। আর এই মোড়ল মাতব্বরেরা সরকারী দলের ছত্রছায়ায় আশ্রয় নেওয়ায় সরকার তাদের স্বার্থ বিঘ্নিত করে কিছু করতে আগ্রহী ছিল না। এর ফলে প্রাক স্বাধীনতা যুগের ফ্লাড কমিশনের সুপারিশ তৎকালীন মুসলিম লীগ সরকার বা পরবর্তীকালে কংগ্রেস সরকার কার্যকর করার তেমন চেষ্টা করেনি। এরই পরিপ্রেক্ষিতে নিখিলবঙ্গ প্রাদেশিক কিষাণসভা ফ্লাড কমিশনের তেভাগা সংক্রান্ত সুপারিশগুলো সরকারকে দিয়ে চালু করার লক্ষ্যে গণআন্দোলন শুরু করার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু প্রয়োজনীয় সদিচ্ছার অভাবে সেই আন্দোলন বিশেষ ফলপ্রসূ হতে পারেনি। অশোক মিত্র লিখছেন, "১৯৪৯ সালের বঙ্গীয় প্রাদেশিক কিষাণ সভার ঘোষিত গণআন্দোলনের ডাকে সি পি আইয়ের সবস্তর একজোটে সাড়া দেয়নি। তদানীন্তন সংবাদপত্র গুলি চোখ বুলিয়ে দেখলেই এই উক্তির সমর্থন মিলবে। উল্টে সি পি আইয়ের সংখ্যা গরিষ্ঠ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়টি ছিল তেভাগা বিষয়ে উদাসীন।"[২৮] হক মন্ত্রীসভার প্রণীত বঙ্গীয় কৃষিঋণ মকুব আইনও মুর্শিদাবাদে তেমন প্রয়োগ হয়নি। এই আইনে প্রজাদের যে সব জমি ঋণের পরিবর্তে জমিদারের কাছে বন্ধক থাকত ও বছরের পর বছর জমিদার তার উপস্বত্ত্ব ভোগ করলেও চাষীর ঋণ শোধ না হয়ে চক্রবৃদ্ধি হারে বেড়ে যেত সেই সব জমি ঋণসালিসী বোর্ডের মাধ্যমে চাষীদের ফেরত দেবার কথা হয়েছিল, আশ্চর্যের বিষয় এই আইন জেলায় তেমনভাবে কার্যকর হয়নি এবং কার্যকর করার জন্য কৃষক সংগঠনগুলির তেমন কোন ভূমিকাও ছিল না।

তা বলে জেলাতে যে কৃষকদের সংগঠিত করার চেষ্টা হয়নি তা কিন্তু নয়। কৃষকদের অসন্তোষকে কাজে লাগিয়ে সংগঠন বাড়ানোর কাজে নেমেছিল প্রায় সব বিরোধী দলই। তত্ত্বগত দিক দিয়ে এরা সবাই ছিলেন বামপন্থী শিবিরের। সেই সময় জেলায় কৃষক অসন্তোষের

কারণ ছিল মূলত দুটি, এক ঃ ভূস্বামী-জমিদার বা মহাজনদের অন্তহীন শোষণ, উদয়াস্ত পরিশ্রম করেও ফসলের ন্যায্য ভাগ না পাওয়া উপরন্তু অজন্মা বা পারিবারিক প্রয়োজনে ঋণ নিতে বাধ্য হলে সেই ঋণের জামিন স্বরূপ বন্ধকী জমি ফেরত না পাওয়ার সমস্যা, দুই ঃ প্রচণ্ড খাদ্যাভাব। স্বাধীনতার পরপরই সারা রাজ্যের সঙ্গে জেলাতেও প্রচণ্ড খাদ্যাভাব দেখা দেয়। এর মূল কারণ ছিল দুটি। দেশভাগের ফলে অবিভক্ত বঙ্গের বেশীরভাগ উর্বর জমিই চলে যায় পূর্ববঙ্গের ভাগে। পাটচাষের জমি চলে গেল পূর্ববঙ্গে আর পাটকলগুলো থেকে গেল এপার বাংলায়। ফলে ঐ পাটকলগুলির প্রয়োজনীয় কাঁচাপাট যোগানোর লক্ষ্যে এপার বাংলার অবশিষ্ট জমিতে পাট চাষ করার জন্য সরকারের তরফে চাষীদের উৎসাহিত করা হয়। ফলে ধান চাষের জমিতেও ব্যাপক হারে পাটচাষ হতে থাকে। সরকারের প্রতিশ্রুতি ছিল পাটের ন্যায্য দাম সুনিশ্চিত করা এবং পাট চাষের ফলে খাদ্যশষ্যের ঘাটতি অন্য রাজ্য থেকে খাদ্য আমদানির মাধ্যমে পূরণ করা। বাস্তবক্ষেত্রে এ দুটোর কোনটাই হয়নি।[৩৯] এর উপরে ছিল পূর্ববঙ্গ থেকে আগত ছিন্নমূল উদ্বাস্তুদের চাপ। খাবার লোক বেড়ে গেল অথচ জমি গেল কমে — এরই ফলশ্রুতিতে স্বাধীনতার পরপরই জেলাতে প্রায় দুর্ভিক্ষের পরিস্থিতি দেখা দেয়। কৃষকদের অসন্তোষ চরমে পৌঁছায়।

১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারী মার্চে কলকাতায় কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে ঘোষণা করা হয় যে, এদেশের কংগ্রেস শাসকেরা ব্রিটিশদের মতোই পুঁজিবাদী শোষণ এবং জমিদার মহাজন, জোতদার ও সামন্তদের শোষণের স্বার্থে দেশকে শাসন করতে চায়। ঐ কংগ্রেসে এই শোষণের বিরুদ্ধে বিপ্লবী সংগ্রাম চালিয়ে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও শোষণহীন সমাজ গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হয়।[৪০] ভীত সন্ত্রস্ত সরকার এর পরপরই ২৫শে মার্চ পার্টিকে বেআইনী ঘোষণা করে এবং সিকিউরিটি অ্যাক্ট অনুযায়ী নেতা ও কর্মীদের গ্রেপ্তার করে। পার্টির নেতাদের বিরুদ্ধে অভিযোগও ছিল নানা ধরেণের যেমন গৌরীচরণ ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল তিনি ক্ষমতা দখলের জন্য বিপ্লব করার লক্ষ্যে কৃষকদের মিলিশিয়া (সামরিক গোষ্ঠী) গড়ে তোলার চেষ্টা করছেন। সনৎ রাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল তিনি বেআইনী বেতার সংযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। নেতারা গ্রেপ্তার হলে স্বাভাবিকভাবেই আন্দোলনের ঢেউ সাময়িকভাবে স্তিমিত হয়ে আসে। এতৎসত্ত্বেও যাদের পুলিশ গ্রেপ্তার করেনি বা পরোয়ানা থাকা সত্ত্বেও যারা গ্রেপ্তার এড়াতে সক্ষম হয়েছিলেন তারা গোপনে কৃষক আন্দোলন সংগঠিত করার চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকেন। তবে একাজে খুব স্বাভাবিক কারণেই খুব বেশী সাফল্য আসেনি। জেলার দু একটি জায়গায় স্থানীয়ভাবে অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি সৃষ্টি হলেও জেলার বিস্তীর্ণ এলাকা ছিল শান্ত। কৃষকদের অসন্তোষকে কাজে লাগিয়ে তাদের সর্বাত্মক আন্দোলনে নামানোর যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে এমনটা ঘটে ছিল একথা বলার সঙ্গত কারণ আছে।

১৯৪৯ সালের ১৬ই অক্টোবর সাগরদীঘি থানার নরসিংহপুর গ্রামে খেতমজুর ও গরীব চাষীদের একটি সম্মেলন হয়। ঐ সম্মেলনে কিষাণী প্রথার বিরুদ্ধে ভাগচাষীর দাবী তেভাগার নিশ্চিতকরণ নিয়ে প্রস্তাব হয়।[৪১] সাগরদীঘি ও নবগ্রাম থানা ছিল জেলার কৃষক

আন্দোলনের সূতিকাগর। মহ্যমপুর, হাড়ডাঙ্গা, চন্দ্রদীঘি, হরিণডাঙ্গা প্রভৃতি গ্রাম ছিল আন্দোলনের মূল কেন্দ্র। ঐ অঞ্চলে কৃষক আন্দোলনের নেতা হিসাবে সক্রিয় ছিলেন সুধীন সেন, জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য, কালীপদ রায়, সমর অধিকারী, আব্দুস সঈদ মল্লিক, রবি চৌধুরী, লবা মাঝি, ধীরেন খাঁ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। ১৯৪৯ -এর নভেম্বরে সুধীন সেন ও জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য চোরদীঘি থেকে গ্রেপ্তার হন। পরের মাসেই সাগরদীঘি থানার তেভাগা আন্দোলনের মূল কেন্দ্র হরিণডাঙ্গা গ্রাম থেকে গ্রেপ্তার হন সমর অধিকারী, কালিপদ রায়, রবি চৌধুরী প্রমুখ ৮ জন নেতা ও কর্মী। এর আগেও এই সব নেতারা একবার গ্রেপ্তার হয়েছিলেন কিন্তু সাঁওতাল কৃষকেরা থানা ঘেরাও করলে পুলিশ অনিচ্ছাসত্ত্বেও নেতাদের মুক্তি দিতে বাধ্য হয়।

সাগরদীঘি ও নবগ্রাম থানায় যেমন আন্দোলনের তীব্রতা ছিল সর্বাধিক তেমনি পুলিশি দমননীতিও ছিল মাত্রাছাড়া। দমন পীড়নের বিরুদ্ধে চাষী কৃষকদের ক্ষোভও ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। ১৯৫০ সালের ৪ঠা জানুয়ারী সরকার কৃষক সমিতি, ছাত্র ফেডারেশন, ক্ষেত মজুর ইউনিয়ন, নওযোয়ান সংঘ, ছাত্রী সংঘ মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি প্রভৃতি ৭টি প্রতিষ্ঠানকে বেআইনী ঘোষণা করে। আবার নেতা ও কর্মীদের গ্রেপ্তারের হিড়িক আসে। গাঁথলার কৃষকনেতা হকসেদ সেখ, এরশাদ সেখ, মহিলানেত্রী শঙ্করী সরকার, অন্নপূর্ণা ভট্টাচার্য, ছাত্রনেতা প্রভাত সিহি, জীবন ঘোষাল, কৃষ্ণপদ হালদার, নীহার সরকার, রিক্সাচালক ও শ্রমিকনেতা ভূপেন দত্ত প্রমুখকে স্বগৃহে অন্তরীণ করে তাদের স্বাভাবিক গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করা হয়। শক্তিপুরের মৎসজীবী নেতা শঙ্কর হালদারকে ধরতে না পেরে পুলিশ তার ঘরবাড়ী শীল করে দেয়।[৪২]

সরকারী দমননীতি তীব্র হওয়ার সাথে সাথে সাধারণ মানুষদের সরকার বিরূপতা বাড়তে থাকে। ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী নবগ্রাম ও সাগরদীঘি থানার বিক্ষুব্ধ কৃষকদের এক জঙ্গী শোভাযাত্রা বহরমপুরে আসে। বিক্ষুব্ধ চাষীদের অধিকাংশই ছিল সাঁওতাল আদিবাসী। পুলিশ এই মিছিলে লাঠিচার্জ করে, টিয়ার গ্যাস চালায় ও নেতাদের গ্রেপ্তার করে গ্রেপ্তার হওয়া নেতাদের মধ্যে ছিলেন লবা মাঝি, সালকু মাঝি, মদন হেমব্রম, চৌকি মাঝি, মাতু মসেহার প্রমখ। বিচারে কয়েক জনের সাজা হয়। বিচারাধীন অবস্থাতেই লবা মাঝির মৃত্যু হয়।[৪৩]

খাদ্যের অভাব, জিনিসপত্রের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধিতে জেলায় প্রায় দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কালোবাজারি, মজুত দারিতে হাত পাকানো অসাধু ব্যবসায়ী দল এই পরিস্থিতির পূর্ণ সুযোগ নেয়। পরিস্থিতি আরো জটিল করে তোলে সরকারের কর্ডন নীতি। জেলার শস্য ভাণ্ডার কান্দী মহকুমা থেকে বাগড়ী এলাকায় চাল সরবরাহের উপর সরকার নিষেধাজ্ঞা আরোপ করায় পোয়াবারো হয় অসাধু ব্যবসায়ীদের। তারা বাজার থেকে চাল উধাও করে দিয়ে চালের কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে। চালের দাম হু হু করে বেড়ে যায়। সাধারণ মানুষদের কষ্ট চরমে পৌঁছায়। এই পরিস্থিতিতে ১৯৫০ সালের ৫ই আগষ্ট বহরমপুরে সংগঠিত হয় ঐতিহাসিক দূর্ভিক্ষ প্রতিরোধ মহামিছিল। বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক দল (আর এস পি) ছিল এই মিছিলের উদ্যোক্তা। মিছিলের নেতৃত্বে ছিলেন

নির্মল বাগচী, দিলীপ সিংহ, রাধারঞ্জন গুপ্ত, শচীন দেবনাথ, নবকৃষ্ণ চ্যাটার্জী, রথীন মজুমদার, ভোলানাথ মন্ডল, ইপ্সিতা বিশ্বাস, সুভা ভট্ট, দেবী ব্যানার্জী, রাজলক্ষ্মী দেবী, তুষারময় রায়চৌধুরী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। মুর্শিদাবাদের জেলাশাসক তখন অমিতাভ নিয়োগী। বুভুক্ষ মানুষের সেই মিছিল সারা শহর পরিক্রমা করে জেলা শাসকের বাংলোর সামনে হাজির হয়। ওসি প্রাণগোবিন্দ চক্রবর্তীর নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনীও তখন সেখানে হাজির। জেলাশাসক বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে দেখা করতে রাজী না হওয়ায় মিছিল উত্তাল হয়ে ওঠে। বেপরোয়া পুলিশ লাঠি হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে মিছিলের উপর। ছোঁড়া হয় টিয়ার গ্যাস। বিক্ষোভরত ছাত্রনেত্রী ইপ্সিতা বিশ্বাসের চুলের মুঠি ধরে খোয়া বিছানো রাস্তা দিয়ে টেনে এনে জেলাশাসকের বাংলোর গাড়ী বারান্দার নীচে রাখার দৃশ্য নিজের জীবন বিপন্ন করে ক্যামেরাবন্দী করে রাখেন বহরমপুর শহরের প্রবীণ ফটোগ্রাফার ভেন্টুজ। পরদিন কোলকাতা থেকে প্রকাশিত শরৎচন্দ্র বসু (নেতাজীর অগ্রজ) সম্পাদিত 'দি নেশান' পত্রিকায় চারকলম সংবাদের সঙ্গে ইপ্সিতাদেবীর কেশকর্শনরত ছবিটি প্রকাশিত হয় — সংবাদ শিরোনাম ছিল 'নট ফুড বাট টিয়ার গ্যাস অ্যান্ড লাঠিচার্জ'।[৪৪] পুলিশের এই বর্বরতার প্রতিবাদে সারা জেলার সঙ্গে প্রতিবাদে উত্তাল হয়ে ওঠে সারা পশ্চিমবঙ্গ। পরবর্তীকালে কোলকাতার খাদ্য আন্দোলনের পথিকৃত বলা যেতে পারে মুর্শিদাবাদের এই খাদ্যের দাবীতে সংগঠিত আন্দোলনকে।

গণআন্দোলন যত তীব্র হয়ে ওঠে সরকারী দমননীতিও তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তীব্রতর হয়। পদে পদে লঙ্ঘিত হয় ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার। অথচ তখন সরকারী ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত দল কংগ্রেস। কংগ্রেসী প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহেরু ব্যক্তি স্বাধীনতার একনিষ্ঠ সমর্থক। তাঁর স্পষ্ট মতামত হল "যে সরকার ফৌজদারী আইন সংশোধন অ্যাক্ট ও অনুরূপ আইনের ক্ষমতার উপর নির্ভর করে, যাহারা সংবাদ পত্রের ও মুদ্রণের স্বাধীনতা হরণ করে সংবাদপত্র বন্ধ করে দেয়, শত শত প্রতিষ্ঠান কে বেআইনী ঘোষণা করে ও বিনা বিচারে দেশের লোককে কারারুদ্ধ করে রাখে ...... সে সরকারের দেশ শাসন করার কোন অধিকার নেই।"[৪৫] তবে এই মত ছিল সেই জহরলালের যখন তিনি সরকারে ছিলেন না। সরকারে এসে তাঁরই দলের গণআন্দোলন দমনে ন্যাক্কার জনক ভূমিকা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একটি সাধারণ নিয়মকে সত্য প্রমাণিত করে। বিরোধীদল ক্ষমতায় আসার আগে যত সব ভালো ভালো কথা বলে রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসলে তাঁরা পরিস্থিতির চাপে সেই সব প্রতিশ্রুতির কথা ভুলে যায় বা ভুলে যেতে বাধ্য হয়। পুলিশ বাহিনী দিয়ে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলে রাখাই তখন তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায়। ভারতবর্ষ থেকে ভিয়েতনাম, আমেরিকা থেকে আন্দামান, পশ্চিমবঙ্গ থেকে পশ্চিম জার্মানী শাসক শ্রেণীর চরিত্র সর্বত্রই একই রকমের।

স্বাধীনতা পরবর্তীকালে গণআন্দোলন দমনের নামে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস তীব্রতর হতে থাকায় সমাজের বুদ্ধিজীবি মহল প্রতিবাদ মুখর হয়ে ওঠেন। ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার যখন বিপন্ন, বিচারের বাণী যখন নিভৃতে কাঁদছে তখনই ড. মেঘনাদ সাহাকে সভাপতি, ক্ষিতিশ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়কে কার্যকরী সভাপতি এবং প্রমোদরঞ্জন সেনগুপ্তকে সম্পাদক করে

কোলকাতায় ব্যক্তি স্বাধীনতা সংঘ গড়ে ওঠে। শুধু কলকাতা নয় এ জেলায়ও ব্যক্তি স্বাধীনতা সুরক্ষিত রাখার জন্য অনুরূপ সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হওয়ায় ১৯৫০ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী বহরমপুর ভৈরবতলা ঘাটে শহরের বুদ্ধিজীবি ও বামপন্থী নেতৃত্বের উপস্থিতিতে 'মুর্শিদাবাদ জেলা ব্যক্তি স্বাধীনতা সংঘ' প্রতিষ্ঠিত হয়।[৪৪] জেলার প্রখ্যাত আইনজীবি শশাঙ্কশেখর সান্যাল এই সংঘের সভাপতি ও প্রাদেশিক গণতান্ত্রিক আইনজীবি সংঘের সদস্য এবং বিশিষ্ট ট্রেড ইউনিয়ন নেতা শ্রীবিজয় গুপ্ত সম্পাদক নির্বাচিত হন। গঠিত হয় ২২ জনের এক কার্যনির্বাহক কমিটি। ৬ই এপ্রিল কমিটির প্রথম বৈঠকে ঠিক হয়, "কংগ্রেসী আমলে অর্থাৎ ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্টের পর থেকে রাজনৈতিক কারণে নানা অজুহাতে মুর্শিদাবাদ জেলার যে সব নাগরিকদের ব্যক্তি স্বাধীনতা খর্ব করা হয়েছে, নানা মিথ্যা অজুহাতে কংগ্রেসী সরকার যে সমস্ত নাগরিককে দিনের পর দিন আসামীর কাঠগড়ায় হাজির করার পর কোন কারণ না দেখিয়েই সেই সব মোকদ্দমা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়েছেন ....." সেই সব বিষয়গুলিকে জনসমক্ষে আনার জন্য তার ধারাবাহিক বিবরণ পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করা হবে। ব্যক্তি স্বাধীনতা সংঘ তাদের প্রকাশিত ইস্তাহারে দাবী তুলেছিল, "রাউলাট এক্ট সদৃশ কালাকানুন এবং জনস্বার্থ বিরোধী অর্ডিন্যান্সগুলি প্রত্যাহার করতে হবে। ইংরেজ সৃষ্ট কুখ্যাত বক্সাবন্দী শিবির তুলে দিতে হবে। বিনা শর্তে জেলার এবং প্রদেশের সমস্ত রাজবন্দীদের মুক্তি দিতে হবে। বেআইনী নয় এরূপ প্রতিষ্ঠানগুলোকে স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ দিতে হবে। জেলার যে সমস্ত কৃষক, শ্রমিক এবং ছাত্রকর্মীর উপর এখনও গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বহাল আছে সেগুলি প্রত্যাহার করতে হবে। শক্তিপুরের কর্মী শঙ্কর হালদারের গৃহ শীলমোহর করে দিয়ে এবং বড়োঞা থানার কর্মী গাজল মন্ডলের ভায়েদের অস্থাবর সম্পত্তি নিলাম করিয়ে যে ক্ষতি করা হয়েছে তার উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ করতে হবে। জেলার রাজনৈতিক মামলাগুলি বিনাশর্তে প্রত্যাহার করতে হবে।"[৪৫]

ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষার জন্য লাগামহীন রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে মুর্শিদাবাদ জেলা ব্যক্তি স্বাধীনতা সংঘ অসামান্য ভূমিকা পালন করেছিল। ১৯৫০ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত মুর্শিদাবাদ জেলার বিনাবিচারে বন্দীর সংখ্যা ছিল ৬। মুর্শিদাবাদ জেলার ব্যক্তি স্বাধীনতা সংঘের প্রকাশিত ইস্তাহার থেকে জানা যায় যে ঐ সময় প্রশাসনিক কারণে সারা পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ৮০০ জন রাজনৈতিক কর্মীকে বন্দী করে রাখা হয়েছিল পরবর্তীকালে তাদের ৬০০ জনকে কলকাতা হাইকোর্ট মুক্তি দেন। হাইকোর্ট মন্তব্য করে যে প্রশাসনিক নির্দেশে রাজনৈতিক কর্মীদের ব্যক্তি স্বাধীনতা হরণ করে বন্দী করা হয়েছিল তার অধিকাংশই ছিল দুরভিসন্ধিমূলক (Mischevious) অথবা ভেবেচিন্তে দেওয়া হয়নি।

মুর্শিদাবাদ জেলা ব্যক্তি স্বাধীনতা সংঘ তার প্রশংসনীয় কাজকর্মের মধ্য দিয়ে সারা রাজ্য এমনকি অন্যান্য রাজ্যেরও দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হয়েছিল। বহরমপুর শহরের বাইরেও কান্দী, নবগ্রাম, জিয়াগঞ্জ, আজিমগঞ্জ, ভরতপুর, বেলডাঙ্গা, সাগরদীঘি, বড়োঞা প্রভৃতি জায়গায় সংঘের শাখা সংগঠন গড়ে ওঠে। ১৯৫১ সালের ৫ই মে কোলকাতার কমার্শিয়াল মিউজিয়াম হলে পশ্চিমবঙ্গ ব্যক্তি স্বাধীনতা কমিটির উদ্যোগে রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি

আন্দোলনের রূপরেখা তৈরী সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে এক কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন মুর্শিদাবাদ জেলার বিশিষ্ট জননেতা ছত্রপতি রায়। ঐ সম্মেলনে উপস্থিত হয়ে বক্তব্য রাখেন বঙ্কিম মুখার্জী, ক্ষিতিশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, মুজফ্‌ফর আহমেদ, হেমন্ত বসু, প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ বিখ্যাত ব্যক্তিত্বরা[৪৮]।

এইসব গণআন্দোলনের ঢেউ আর তার প্রতিক্রিয়ায় সরকারের লাগামহীন দমননীতি স্বাধীনতা পরবর্তী কয়েকটি বৎসর জেলার সামাজিক রাজনৈতিক ক্ষেত্রকে সরগরম করে রেখেছিল। এরই মধ্যে এসে পড়ল প্রথম সাধারণ নির্বচন। কংগ্রেসী সরকারের দমনপীড়নের প্রতিবাদে বিরোধী দলগুলো মুখর হলেও তাদের তেমন কোন সাংগঠনিক শক্তি নেই। নেই সারা জেলা জুড়ে ব্যাপক জনভিত্তি। জেলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগোষ্ঠী তখন নিরাপত্তাজনিত কারণে কংগ্রেসের পতাকাতলে। প্রায় মুফতে মুসলমান জনগোষ্ঠীর সমর্থন পেয়ে যাওয়ায় কংগ্রেস তখন শক্ত মাটির উপর দাঁড়িয়ে।[৪৯] সর্বোপরি ব্রিটিশদের সঙ্গে নিরন্তর লড়াই -এ কংগ্রেসের সংগ্রামী ভূমিকার জন্য সাধারণ মানুষদের কংগ্রেসের প্রতি একটা মোহ ছিলই, এর উপরে ছিল বিরোধী দলগুলোর ছন্নছাড়া অবস্থা। তারা সরকারকে জেরার করার জন্য নানা আন্দোলনে উৎসাহ দেখালেও পার্টির গণভিত্তি বাড়াতে তেমন নজর দেয়নি। ফলে কংগ্রেসের বিকল্প রাজনৈতিক শক্তি ছিলই না। এমত পরিস্থিতিতে বিরোধী দলগুলো একসঙ্গে মিলে তৈরী করল ইউনাইটেড প্রোগ্রেসিভ ব্লক। সি পি আই, আর এস পি, ফরওয়ার্ড ব্লক, পি এস পি প্রভৃতি দলের এই সম্মিলিত উদ্যম জেলার রাজনীতিতে নতুন দিক নির্দেশক হয়ে দাঁড়ায়। ইউ পি বি প্রার্থী হিসাবে বহরমপুর লোক সভা কেন্দ্রে ত্রিদিব চৌধুরীর জয় পরবর্তীকালে জেলার রাজনীতিকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করে। কিন্তু সে অন্য প্রসঙ্গ, দেশবিভাগের ক্রান্তিকাল প্রথম সাধারণ নির্বাচন পর্যন্তই।

তথ্য নির্দেশ ঃ

১. আজাদ, আবুল কালাম, ভারত স্বাধীন হল, পৃঃ ২০৯

১ ক. আহমেদ খাজিম — দেশ-বিভাগ-পরবর্তী মুর্শিদাবাদের রাজনীতিতে মুসলমানদের ভূমিকা, বার্ষিক মুর্শিদাবাদ বীক্ষণ, ১৯৯০, পৃঃ গ-১

২. রাহা, সনৎ — কমিউনিস্ট আন্দোলনে মুর্শিদাবাদ, প্রথম খণ্ড, ১৯৩৮-১৯৬৪, পৃঃ ২৬

৩. গুপ্ত, রাধারঞ্জন — অবিস্মরণীয় অথচ বিস্মৃতপ্রায় এক অনন্য সাধারণ ব্যক্তিত্ব নিতাই গুপ্ত, জনমত, ১৭ই মে ২০০০

৪. গণকন্ঠ, বিশেষ সংখ্যা ১৯৮৮, পৃঃ ই - ৮২

৫. মুখোপাধ্যায়, অমল কুমার, বাঙালি রাজনীতির পঞ্চাশ বছর (১৯৪৭-১৯৯৭), কোলকাতা, ১৯৯৯, পৃঃ - ৭
৬. মুখোপাধ্যায়, অমল কুমার, বাঙালী রাজনীতির পঞ্চাশ বছর (১৯৪৭-১৯৯৭), কোলকাতা, ১৯৯৯, পৃঃ - ১১
৭. রায়, অন্নদাশংকর, এই সময়, কোলকাতা, ১৯৮৯, পৃঃ ১৩
৮. ঐ পৃঃ - ১৩
৯. গোডসে, গোপাল, গান্ধী হত্যা কেন, অনুবাদ শান্তি দত্ত, পৃঃ ১৫
১০. রায়, অন্নদাশংকর, এই সময়, পৃঃ - ১৩
১১. রায়, অন্নদাশংকর, যৌবন সায়াহ্ন, আনন্দবাজার পত্রিকা, শারদীয়া ১৪০৪, পৃঃ - ৬৪
১২. মিত্র, অশোক, তিন কুড়ি দশ, তৃতীয় খণ্ড, নতুন ভারত, ১৯৪৮-১৯৫৫, পৃঃ - ৪৯ কোলকাতা, ১৯৯১
১৩. রায়, অন্নদাশংকর , যৌবন সায়াহ্ন, পৃঃ - ৬৪
১৪. মিত্র, অশোক, পূর্বোক্ত, পৃঃ - ৪৮
১৫. রায়, অন্নদাশংকর, যৌবন সায়াহ্ন, পৃঃ - ৬৫
১৬. করীম, রেজাউল, স্বাধীনতার এক বৎসর, গণরাজ, ১৫ই আগস্ট ১৯৪৮, পৃঃ - ৫, জহর সেন উদ্ধৃত করেছেন তাঁর জীবনীগ্রন্থ 'রেজাউল করীম' -এ পৃঃ - ১৪
১৭. করীম, রেজাউল, পূর্বোক্ত, পৃঃ - ৫
১৮. করীম, রেজাউল, পূর্বোক্ত, পৃঃ - ৭
১৯. মিত্র, অশোক, পূর্বোক্ত, পৃঃ - ৫০
২০. মিত্র, অশোক, পূর্বোক্ত, পৃঃ - ৫০
২১. রায়, অন্নদাশংকর, আই সি এস, পৃঃ - ১০৪, কোলকাতা, ১৩৮৫
২২. মিত্র, অশোক, পূর্বোক্ত, পৃঃ - ৫০
২৩. গুপ্ত, বিজয়কুমার, মুর্শিদাবাদ জেলা ব্যক্তি স্বাধীনতা সংঘের ইস্তাহার, পৃঃ - ৪
২৪. মিত্র, অশোক, পূর্বোক্ত, পৃঃ - ৭৪
২৫. গুপ্ত, বিজয়কুমার, মুর্শিদাবাদ জেলার ডাক বিভাগীয় কর্মীদের আন্দোলনের রূপরেখা, মুর্শিদাবাদ বীক্ষণ শারদ সংখ্যা ১৯৮৯, পুনর্মুদ্রণ বার্ষিক মুর্শিদাবাদ বীক্ষণ, ১৯৬৬
২৬. মিত্র, অশোক, পূর্বোক্ত, পৃঃ - ৭৪
২৭. চট্টোপাধ্যায়, অপরেশ, হলদীর লড়াই, ফিরে দেখা, মুর্শিদাবাদ বীক্ষণ, ১৬ই মার্চ ১৯৯৯
২৮. মিত্র, অশোক, পূর্বোক্ত, পৃঃ - ৭৬
২৯. সেন, জহর, রেজাউল করীম (১৯০২-১৯৯৩) পৃঃ - ১৫, কোলকাতা, ১৪০৭
৩০. করীম, রেজাউল, মুর্শিদাবাদ জেলার মুসলমান সমাজের প্রতি নিবেদন, গণরাজ ২৯শে জুন ১৯৪৯, জহর সেন উদ্ধৃত করেছেন তাঁর পূর্বোক্ত বইয়ে পৃঃ ১৫
৩১. করীম, রেজাউল, পূর্বোক্ত, পৃঃ - ১৬
৩২. করীম, রেজাউল, পূর্বোক্ত, পৃঃ - ৭
৩৩. মিত্র, অশোক, পূর্বোক্ত, পৃঃ - ৬২
৩৪. চক্রবর্তী, মনমোহন, এ সামারি অফ দি চেঞ্জেস ইন দি জুরিসডিকশন অফ ডিস্ট্রিক্টস ইন বেঙ্গল ১৭৫৭-১৯১৬, পৃঃ - ১৬৪ কোলকাতা, ১৯৯৯
৩৫. চক্রবর্তী, মনমোহন, পূর্বোক্ত, পৃঃ - ২১২

৩৬. মিত্র, অশোক, পূর্বোক্ত, পৃঃ - ৮৯

৩৭. মিত্র, অশোক, পূর্বোক্ত, পৃঃ - ৮৭

৩৮. মিত্র, অশোক, পূর্বোক্ত, পৃঃ - ৮৯

৩৯. আনম, মহম্মদ খয়রুল, মুর্শিদাবাদ জেলায় কৃষক আন্দোলন, ১৯৪৭-১৯৭১ বার্ষিক মুর্শিদাবাদ বীক্ষণ, ১৯৯৮, পৃঃ - ২৬

৪০. আনম, মহম্মদ খয়রুল, পূর্বোক্ত

৪১. রাহা, সনৎ, পূর্বোক্ত, পৃঃ - ৩৪

৪২. গুপ্ত, বিজয়কুমার, মুর্শিদাবাদ জেলা ব্যক্তি স্বাধীনতা সংঘের ইস্তাহার, পৃঃ - ১১

৪৩. আনম, মহম্মদ খয়রুল, পূর্বোক্ত, পৃঃ - ৩৪

৪৪. গুপ্ত, রাধারঞ্জন, পূর্বোক্ত, জনমত ২২শে মে ২০০০, ইপ্সিতা গুপ্ত, একটি অনন্যা সাধারণ চরিত্র, চিত্ত দাস ও খাজিম আহমেদ।

৪৫. ১৯৩৬ সালে এ আই সি সি'র লক্ষ্মৌ অধিবেশনে প্রদত্ত জহরলাল নেহেরুর বক্তৃতার অংশ বিশেষ। বিজয় কুমার গুপ্ত উদ্ধৃত করেছেন পূর্বোক্ত ইস্তাহারে।

৪৬. গুপ্ত, বিষাণকুমার, ব্যক্তি স্বাধীনতা আন্দোলন ও মুর্শিদাবাদ জেলা ১৯৪৭-১৯৬৭, মুর্শিদাবাদ বীক্ষণ, ১-১৫ জুন, ১৯৯৪

৪৭. গুপ্ত, বিজয়কুমার, পূর্বোক্ত, ইস্তাহার পৃঃ - ১৭

৪৮. গুপ্ত, বিজয়কুমার, পূর্বোক্ত, ইস্তাহার

৪৯. আহমেদ, খাজিম, পূর্বোক্ত

এই লেখকের অন্য বই ঃ

ভেজাল ধরার প্রথম পাঠ (সম্পাদনা)
প্রশ্নোত্তরে মুর্শিদাবাদ (সম্পাদনা)
মুর্শিদাবাদের মনীষী
মুর্শিদাবাদের পথ ও পরিবহনের সেকাল একাল